কুসুমকুমারী দাসের
কবিতা

কুসুমকুমারী দাসের

কবিতা

সুমিতা চক্রবর্তী
সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২



সূচিপত্র

পূর্বকথা

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কর্মের অবকাশে জীবনানন্দ দাশ এবং তাঁর সাহিত্যকৃতি নিয়ে কিছু-কিছু আলোচনা করেছিলাম বিভিন্ন প্রবন্ধে। সেই সূত্রে জীবনানন্দ-জননী কুসুমকুমারী দাস-সম্পর্কেও কিছু তথ্য হাতে এসেছিল পুরনো পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে। বিশেষ করে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘকাল। সেই পত্রিকায় জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ এবং মাতা কুসুমকুমারীর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল—তাঁদের সম্পর্কে অনেক সংবাদ সেখানে লিপিবদ্ধ আছে। কুসুমকুমারী তাঁর সমকালে কবি হিসাবে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। যদিও তাঁর কোনো কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'—এই প্রবাদপ্রতিম পংক্তি-দুটি আমাদের কাছে বহু-পরিচিত। কিন্তু এখনও অনেকে মনে করতে পারেন না এই কবিতার রচয়িত্রীর নাম। তিনিই কুসুমকুমারী। কেবল কবি নন—ব্রাহ্ম-সমাজের এক সক্রিয় কর্মী, সু-শিক্ষিতা, বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

তখন থেকেই মনে হয়েছিল, কুসুমকুমারী দাস কবি জীবনানন্দ দাশের জননী—কিন্তু তা-ছাড়াও তাঁর একটি নিজস্ব ব্যক্তি-পরিচয় আছে; কবি-পরিচয়ও আছে। কুসুমকুমারী দাসকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছে বহুদিন থেকেই মনের মধ্যে লালিত হয়েছিল। আকস্মিকভাবে পরিচয় হয় কুসুমকুমারীর কনিষ্ঠ পুত্র অশোকানন্দ দাশ এবং পুত্রবধূ নলিনী দাশের সঙ্গে। নলিনী দাশ শিক্ষাক্ষেত্রে স্বনামে পরিচিত এক কৃতী মহিলা। তিনি আমাকে কুসুমকুমারী-সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়েছিলেন এবং দেখতে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে যত্নে-রক্ষিত কয়েকটি জীর্ণ খাতা। এই খাতাগুলিতে ছিল কুসুমকুমারীর টুকরো কবিতা—দিনলিপি, আত্মস্মৃতি এবং বিভিন্ন ধরনের স্বহস্ত-কৃত অনুলিপি।

অবশেষে কুসুমকুমারী দাস-কে নিয়ে রচিত আমার দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় (২৬ জুন, ১৯৮২)।

কুসুমকুমারী দাসের কবিতার সংকলন-প্রকাশের পরিকল্পনা সম্পূর্ণই ভারবি প্রকাশনা-সংস্থার স্বত্বাধিকারী গোপীমোহন সিংহরায় মশাইয়ের। তিনি আমাকে এই কাজটির ভার নিতে অনুরোধ করেন। তারই ফল এই সংকলন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ঢাকার 'অবসর প্রকাশনা-সংস্থা' থেকে কুসুমকুমারীর একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত

হয়েছে (ফেব্রুয়ারি, ২০০১)। সংকলন করেছেন শ্রীমতী লায়লা জামান। শ্রীমতী জামান কুসুমকুমারীর জীবনী-অংশটি সম্পূর্ণই আমার প্রবন্ধ থেকে সংকলন করেছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে তা স্বীকার করেছেন। শ্রীমতী জামান কলকাতায় এসে সংকলনটি আমার হাতে দিয়েও গেছেন। সেই সংকলনে কুসুমকুমারীর উনপঞ্চাশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে এবং চৌষট্টিটি কবিতার ও একটি প্রবন্ধের তালিকাও প্রদত্ত হয়েছে। সেই সংকলন পশ্চিমবাংলায় পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কাজেই পশ্চিমবাংলায় কুসুমকুমারী দাসের একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হবার দাবি যেন আপনা থেকেই জোরালো হয়ে উঠছিল। এই-সময়ে ভারবি-র প্রস্তাব আমার কাছে আসায় আমি তা গ্রহণ করি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে কুসুমকুমারী দাসের পঁচাত্তরটি কবিতা এখানে সংকলিত করা সম্ভব হল।

কুসুমকুমারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, কয়েকটি অপ্রকাশিত টুকরো কবিতা এবং তাঁর দিনলিপির কিছু-অংশও এখানে সংকলিত হল।

কুসুমকুমারীর জীবন-তথ্য সংগ্রহে এবং কবিতার সন্ধানে যেসব উৎস থেকে সূত্র পেয়েছি তা হল, জীবনানন্দের 'আমার মা-বাবা' (উত্তরসূরি, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ; কুসুমকুমারীর নিজের লেখা খাতা—যা নলিনী দাশের কাছে রক্ষিত ছিল; ক্লিন্টন বুথ সীলি-র লেখা জীবনানন্দের জীবনী : 'আ পোয়েট আপার্ট (University of Delaware Press, 1990); যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-রচিত 'বঙ্গের মহিলা কবি' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬০)। জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুরনো পত্রিকা ঘেঁটে কুসুমকুমারীর কবিতা উদ্ধার করবার কাজে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন আমার স্নেহভাজন ড. অপর্ণা দাশ, সৈয়দ বসিরুদ্দোজা ও সুশান্ত দাস। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার কাজে সাহায্য করেছেন আমার দুই ছাত্র মনোরঞ্জন নস্কর এবং ফটিকচাঁদ ঘোষ। আনুষঙ্গিক সহায়তা করেছেন যতীন্দ্রনাথ সরকার এবং সুশান্ত দাস। ভারবি-র পক্ষে গোরা সিংহরায় সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে সুন্দর রূপাবয়ব দান করেছেন। প্রচ্ছদ-শিল্পী এবং মুদ্রণ-কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

কুসুমকুমারী দাসের যথাযোগ্য স্থানটি বাংলা সাহিত্যে সংরক্ষিত থাকবে—এই প্রত্যাশায় পাঠকদের উদ্দেশে সংকলনটি নিবেদিত হল।

কৃষ্ণচূড়া অ্যাপার্টমেন্টস,
৮৫ - এ/১, ইব্রাহিমপুর রোড
যাদবপুর। কলকাতা - ৭০০০৩২

সুমিতা চক্রবর্তী
১০.৯.২০০১

জীবনকথা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক—বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় যে-কয়েকজন মহিলার কবিতা চোখে পড়ত তাঁদের একজন ছিলেন কুসুমকুমারী দাস। গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবীর তুলনায় তাঁর নাম কম পরিচিত। তার প্রথম কারণ তাঁর কোনো প্রকাশিত কবিতা-সংকলন পাঠকের হাতে এসে পৌঁছয়নি। দ্বিতীয় কারণ : তাঁর বসবাস ছিল পূর্ব-বাংলার বরিশালে। কলকাতা শহরের পাদপ্রদীপের আলোয় তিনি কখনই এসে দাঁড়াননি। তাই তাঁর নাম উল্লেখিত হয়নি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) পুস্তিকাটিতে; কিংবা ব্রজেন্দ্রনাথেরই 'বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৭)। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'-তেও কুসুমকুমারী দাসের জীবন-পরিচিতি প্রদত্ত হয়নি।

'বঙ্গের মহিলা-কবি' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে কুসুমকুমারী দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী-তথ্য দিয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সেখানে অনবধান-জনিত একটি ভ্রান্তি আছে। যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাখরগঞ্জ জেলার প্রধান শহর বরিশালে ১২৮৯ সালের ২১ শে পৌষ কুসুমকুমারী জন্মগ্রহণ করেন।' তারপরে লিখেছেন, '১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৯ বৎসরের বয়সে সত্যানন্দ দাস মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়।' শেষে লিখেছেন, 'বাংলা ১৩৫৫ সালের ১০ই পৌষ ৭৩ বৎসর বয়সে উপযুক্ত পুত্রকন্যা-বধূ আদরের পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।' দেখাই যাচ্ছে, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হলে ১৮৯৪-এ উনিশ বা ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিয়াত্তর বছর বয়স হওয়া সম্ভব নয়। হওয়া উচিত : বারো ও ছেষট্টি। কুসুমকুমারীর শেষ-শয্যায় বহু আত্মীয়বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স তিয়াত্তরই ছিল। তার চেয়েও বড় প্রমাণ তাঁর ডায়রি থেকে পাওয়া যায়। ৬.১.৪৭. তারিখে তিনি লিখেছেন, 'আজ ২১শে পৌষ সোমবার—জীবনের ৭২ বৎসর উত্তীর্ণ করিলাম।'

কাজেই কুসুমকুমারীর জন্মসাল ১২৮৯ বঙ্গাব্দের চেয়ে সাত বছর পিছিয়ে হবে ১২৮২ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ। মনে হয়—যোগেন্দ্রনাথ ১২৮২-ই লিখেছিলেন : মুদ্রণ-প্রমাদের ফলে 'দুই'-সংখ্যাটি 'নয়' হয়ে যায় এবং তারপর আর লেখকের নজরে পড়েনি।

কুসুমকুমারীর পিতা ছিলেন বরিশালের গৈলা গ্রামের অধিবাসী চন্দ্রনাথ দাস। মা-র নাম ছিল ধনমণি। অগ্রজ কালীমোহন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে চন্দ্রনাথও তাঁকে অনুসরণ করেন। ফলে স্বগ্রামবাসীর বিরোধিতায় পৈতৃক গ্রামে বাস করা অসম্ভব হলে তাঁরা চলে এলেন বরিশাল শহরে। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তখন সর্বানন্দ দাস।[১] তিনি ছিলেন কবি জীবনানন্দের পিতামহ। নিজের বাসসংস্থান করে ওঠার আগে চন্দ্রনাথ তাঁর গৃহেই কিছুদিন বাস করেছিলেন। অর্থাৎ কুসুমকুমারীর জন্মের আগে থেকেই দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

চন্দ্রনাথ ছিলেন প্রবেশিকা পাস। বরিশাল কালেকটরিতে সাধারণ বেতনের কাজ করলেও কর্মসূত্রে কিছুদিন কলকাতায় থাকার ফলে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুন্দরীমোহন দাশ-প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্ম-সজ্জনদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ধর্মভাবাপন্ন ও সৎস্বভাব চন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এই পরিবেশে আরও বর্ধিত হয়। চন্দ্রনাথ দাস লেখকও ছিলেন। 'হাসির গান', 'ক্ষেপার গান' ও 'সাময়িক চিত্র' নামে তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল তাঁর। প্রথম-দুটি গীত সংকলন, তৃতীয়টি কবিতা-সংগ্রহ। 'বামাবোধিনী'তে নিয়মিত লিখতেন। কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য ব্যঙ্গ-কবিতা লিখে দশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন একবার। চন্দ্রনাথের এক পুত্র : প্রিয়নাথ; ও তিন কন্যা : কুসুমকুমারী, সুকুমারী ও হেমন্তকুমারী। এই হেমন্তকুমারী পিতা চন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনীপ্রবন্ধ রচনা করেন। সেটি সংযোজিত হয় চন্দ্রনাথ দাসের 'হাসির গান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (প্রথম সংস্করণ ১৩১৪; নতুন সংস্করণ ১৩৪৬। প্রকাশক : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া)। এই তথ্যবহুল প্রবন্ধটিতে সেই সময়ের বরিশাল ও কুসুমকুমারীর কথা পাওয়া যায়।

কলকাতা বা ঢাকার চেয়ে ছোটো শহর হলেও বরিশালে ছিল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ। বহু সুশিক্ষিত, মান্যগণ্য ব্যক্তির বসবাস ও আনাগোনা ছিল সেখানে। ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের পিতা ব্রজমোহনের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত স্কুল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন। মানসিক সচলতাসজীব, গ্রাম্যতাদোষমুক্ত, ধর্মভাবাপন্ন শিক্ষার একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। হেমন্তকুমারী লিখেছেন, 'সেই অতীত দিনের বরিশাল জ্বলন্ত ধর্মভাবে পূর্ণ ছিল। কত কত জন পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃসমাজ পরিত্যক্ত করত ঃ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া জ্বলন্ত উৎসাহে সমাজের মঙ্গল ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তখন আচার্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক সর্বানন্দ দাস, ডাক্তার জগচ্চন্দ্র দাশ, দেশবিখ্যাত দুর্গামোহন দাশ, আনন্দমোহন দত্ত, চন্দ্রনাথ দাশ, কামিনীকান্ত গুপ্ত, চণ্ডীচরণ সেন, বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন—প্রভৃতির সমাগমে বরিশাল

[১] জীবনানন্দের পিতামহ, পিতা ও মাতা তাঁদের পদবি-র বানান 'দাস' লিখতেন, 'দাশ' নয়। ব্রাহ্মরা দাশ লিখতে শুরু করেন ১৯২০-২১ সাল নাগাদ। সম্ভবত চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবে।

ব্রাহ্মসমাজ দেশে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল।' চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীমোহন দাস ব্রাহ্মমন্দিরের তত্ত্বাবধান ও ব্রাহ্মধর্মপ্রচার করতেন। হেমন্তকুমারী লিখেছেন, 'জ্যেষ্ঠতাতের স্বাভাবিক ধর্মপ্রাচুর্যে এবং পিতৃদেবের নৈতিক শাসনের তলে আমাদের শিশুজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল।' পিতার সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখেছেন, 'আমরা নিঃসম্বল হইলেও আমাদের উচ্চশিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেন নাই।' কুসুমকুমারী একটি বিদ্যানুরাগী পারিবারিক পরিমণ্ডল পেয়েছিলেন আশৈশব। তখন বরিশালে মেয়েদের হাইস্কুল ছিল না। ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ানো হত মাইনর স্কুলে। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে কিছুকালের জন্য বরিশালে মেয়েদের হাইস্কুল করা হয়। ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী ছিলেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কিন্তু হেমন্তকুমারী জানিয়েছেন, 'বালিকাদের সংখ্যার অভাবহেতু সে স্কুল বেশিদিন চালানো সম্ভব হয় নাই। ... আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুসুম এই স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন।' হাইস্কুলটি উঠে গেলে চন্দ্রনাথ মেয়েকে কলকাতায় বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বোর্ডিং-এ জায়গা না থাকায় কিশোরী কন্যাকে রাখার ব্যবস্থা করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে। এই যোগাযোগ করিয়ে দেন ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী। রামানন্দ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রী মনোরমা সহ কলকাতায় চলে আসেন। কিছুদিন মীরজাফর লেনের একটি বাড়িতে (বর্তমানে কলেজ রো) ছিলেন তাঁরা। এখানেই এসেছিলেন কুসুমকুমারী। পরবর্তীকালে কুসুমকুমারী 'স্মৃতি-সুধা' নাম দিয়ে একটি আত্মজীবনী লেখায় হাত দিয়েছিলেন। লেখাটি অবশ্য দু-এক পৃষ্ঠার বেশি এগোয়নি, কিন্তু সেই লেখার প্রথম দিকেই আছে রামানন্দের প্রসঙ্গ : 'বরিশালের পাঠ সাঙ্গ করিয়া আমি যখন কলিকাতায় বেথুন স্কুলে ভর্তি হইলাম, আমাদের পরমাত্মীয় কলিকাতার অভিভাবকরূপে পাঠক ইন্দুভূষণ রায় তাঁহার পরম স্নেহভাজন রামানন্দবাবুর গৃহে আমার বাসের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।' রামানন্দও তাঁর কাছে লেখা চিঠিতে কুসুমকুমারীর উল্লেখ করে বলেছেন, 'এই বাসায় আর-একটি মেয়ে আমাদের কাছে থেকে স্কুলে পড়তেন।' (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, শ্রীশান্তাদেবী, প্রবাসী প্রেস, পৃ. ৩৬)। ১৮১২ সালে রামানন্দের বাড়িতে এক বছর থাকার পর কুসুমকুমারী ১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং-এ লাবণ্যপ্রভা বসুর তত্ত্বাবধানে থেকে পড়তে লাগলেন।

ছোটোবেলা থেকেই কবিতা ও প্রবন্ধ লেখার হাত ছিল কুসুমকুমারীর। রামানন্দ তাঁর এই ক্ষমতাকে সর্বান্তঃকরণে উৎসাহিত করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিশুদের জন্য যে চিত্রশোভিত বর্ণশিক্ষার বই লিখেছিলেন, তার প্রথম ভাগে কুসুমকুমারী-রচিত যুক্তাক্ষরবিহীন ছোটো-ছোটো দু-একটি পদ্যাংশ সংযোজিত করেছিলেন। যেমন—

ছোটো নদী দিনরাত বহে কুলকুল
পরপারে আমগাছে থাকে বুলবুল।

এই বর্ণমালা-শিক্ষার বইটির কথা কেউ-কেউ উল্লেখ করলেও এই বইটিরও সন্ধান করা যায়নি। কবিতাংশটি সংগৃহীত হয়েছে নলিনী দাশের স্মৃতি থেকে। প্রথম পংক্তি উল্লেখিত হয়েছে জীবনানন্দের 'আমার মা-বাবা' (উত্তরসূরি, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬১) প্রবন্ধ থেকে। রামানন্দের স্নেহদৃষ্টি কোনোদিনই কুসুমকুমারীকে পরিত্যাগ করেনি। তাঁর বিবাহের পরেও নিকট-অভিভাবকের মতো তিনি তাঁকে চিঠি লিখতেন। ২৪.৯.৯৬ তারিখে লেখা রামানন্দের একটি পত্র উদ্ধৃত হল :

স্নেহের কুসুম

রাজনারায়ণবাবুর পরিবারে বিবাহের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি জাতিভেদ মানেন। অন্যত্র কোন সন্ধান পাইলে জানাইব।

কাজকর্মের সুবিধা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে লিখিব। এ অঞ্চলে দেশীয় লোকের চালিত ইংরাজী কাগজ মোটে ২ খানি আছে।

পূজার বন্ধ আমাদের মোটে দশ দিন হইবে। সুতরাং আমি কলিকাতা যাইতে পারিব না। আমার জ্বর হইয়াছিল। ভাত খাইয়াছি। কিন্তু এখনও দুর্বল আছি।

বুবা বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। ৩/৪ মাস তাহার পড়াশুনা কিছুই হয় নাই। এখানে আসিয়া আমাদের শরীর ভাল হয় নাই।

স্নেহশীল

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রকাশিত হলে রামানন্দ কুসুমকুমারীকেও প্রবাসীর সর্বমান্য লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে প্রতি মাসে প্রকাশিত প্রবাসী তিনি পাঠিয়ে দিতেন বরিশালে কুসুমকুমারীকে।

১৮৯১ সাল থেকে বেথুন স্কুলের ছাত্রী কুসুমকুমারী। ১৮৯৪-এ প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়তে-পড়তে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। হেমন্তকুমারী লিখেছেন, 'অনুমান ১৩০১ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র সত্যানন্দের সহিত বিবাহ হয়।'

সত্যানন্দের পূর্বপুরুষেরা বিক্রমপুরের কীর্তিনাশা নদীর তীরস্থ গাউপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। একসময়ে তাঁদের জমিদারি ছিল—যার কিছুটা অবহেলায় নষ্ট হয়; কিছু-অংশ বিলীন হয়ে যায় নদীগর্ভে। বরিশাল জেলার বাখরগঞ্জে এসে তাঁরা বসবাস করেন এবং বিভিন্ন-ধরনের সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। সত্যানন্দের পিতা সর্বানন্দ দাসগুপ্ত বরিশালের কালেক্টরিতে কাজ করতেন। তিনিই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৈদ্যত্বের জাতিচিহ্ন-স্বরূপ 'গুপ্ত'-পদবি বর্জন করে সর্বানন্দ দাস নামে পরিচিত হন। বরিশালে স্বগৃহ নির্মাণ করে দাস-পরিবার সেখানে বাস করেন। বাড়ির নাম ছিল 'সর্বানন্দ-ভবন'। সত্যানন্দ ছিলেন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। সুশিক্ষিত, সুনীতিপরায়ণ সত্যানন্দ বরিশালে ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন-এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

বিয়ের পর কুসুমকুমারীর জীবন দুটি-খাতে বইতে শুরু করল। সেকালের একান্নবর্তী বহু মানুষের সংসারে নিয়ত ঘূর্ণায়মান কাজের চাকায় অচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন হয়ে যেত গৃহিণী ও বধূদের জীবন। আলাদাভাবে নিজের জীবনের অন্যতর কোনো সার্থকতার ধারণা প্রায়ই তাঁদের মনে প্রশ্রয় পেত না। সে কথাই বলেছেন জীবনানন্দ, 'বরিশালের বাড়িতে লোকসংখ্যা অনেক ছিল। জেঠিমা ও মাকে সারাদিন গৃহস্থালীর কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। ... কোন রেহাই ছিল না। রেহাই তাঁরা চাননি, পরিশ্রমকে তাঁরা ভয় করতেন না, কর্তব্যবোধ পরিপূর্ণভাবে সজাগ ছিল, দায়িত্বকে এড়াবার কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না।'

—আমার মা বাবা-উত্তরসূরি, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬১।

কিন্তু সংসার কুসুমকুমারীর লিখনকর্মের বাধা হল না। তাঁর বিবাহিত জীবনের পারিবারিক পরিবেশই-শুধু নয়, স্বামীর আনুকূল্য তাঁকে সাহিত্যচর্চায় প্ররোচিত করল। কুসুমকুমারীকে লেখা সত্যানন্দের একটি চিঠিতে এ-সম্পর্কে সত্যানন্দের মনোভাব জানা যায়—যা তাঁর জীবনে কখনই বিচলিত হয়নি : 'সন্তানপালনব্যতীতও একটা কিছু ব্রত গ্রহণ কর—একখানা কিছু লিখিতে আরম্ভ কর।' —চিঠির তারিখ জুলাই ১৯, ১৯০০।

বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের সভা-উৎসব-অনুষ্ঠানে কুসুমকুমারী যোগদান করতেন। ধর্ম, নীতি ও শিক্ষামূলক ছোটো-ছোটো কথিকা-ধরনের প্রবন্ধ-পাঠেরও সুযোগ হত তাঁর। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন যে, আনুমানিক ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'কবিতা-মুকুল' নামে কুসুমকুমারী রচিত একটি ছোটোদের কবিতাসংকলন প্রকাশ করেন এম. এম. মজুমদার। তথ্যটি সমর্থন করেছেন অনেকেই। কিন্তু বইটি পাওয়া যায়নি—যোগেন্দ্রনাথও দেখেননি। বিয়ের দু-বছরের মধ্যেই যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে—তা সত্যানন্দের আগ্রহেই সম্ভব হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। নিজের লেখার প্রকাশ-ব্যাপারে কুসুমকুমারীর খুব বেশি আগ্রহ ছিল না। এর পরেও বহুদিন ধরে তিনি কবিতা লিখেছেন—কিন্তু তাঁর আর কোনো কবিতাসংকলন বেরোয়নি। কুসুমকুমারী তিন-পুত্রকন্যার জননী হয়েছিলেন। জীবনানন্দ (১৮৯৯), অশোকানন্দ (১৯০১) এবং কন্যা সুচরিতা (১৯১৫)। তিনজনেই ছিলেন সুশিক্ষিত। সুচরিতা দাশ কুসুমকুমারীর কবিতা-সংকলনটির নাম 'কাব্য-মুকুল' বলে উল্লেখ করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'পৌরাণিক আখ্যায়িকা'-নামে তাঁর একটি গদ্য-গ্রন্থেরও নাম করেছেন। কিন্তু কোনো বই-ই কেউ-ই দেখেননি।

সংসারের কাজ এবং অবসর-সময়ে লেখার চর্চা ছাড়াও কুসুমকুমারীর জীবনস্রোতের একটি তৃতীয় খাত ছিল—ছিল নিজস্ব ব্যক্তিত্বের একটি স্বকীয় ও স্বতন্ত্র প্রকাশ। তাঁর কর্তব্যবোধ ছিল সুস্পষ্ট, ঔচিত্যবোধ অবিচলিত এবং সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়। সহজে তা থেকে বিচলিত হতেন বলে মনে হয় না। তাঁর কন্যা সুচরিতা দাশ একটি লেখায় জানিয়েছেন : জীবনানন্দের বয়স যখন দু-বছরের মধ্যে তখন তিনি

গুরুতর লিভারের অসুখে আক্রান্ত হন। চিকিৎসক হাওয়া-বদল করতে বলায় কুসুমকুমারী পিতা চন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে বহুদিন ধরে লখনৌ, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর জায়গায় কাটিয়ে শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে ফিরেছিলেন। সে সময়ে তাঁদের অসচ্ছল পারিবারিক অবস্থায় অনেকেরই সমর্থন ছিল না একাজে : 'পুরনো চিঠিপত্র থেকে জানতে পারি মা'র এই প্রচেষ্টাকে পরিবার-পরিজন সকলেই আত্মঘাতী বলে মনে করেছিলেন। তবু বিচলিত হন নি মা। (কাছের জীবনানন্দ। ময়ুখ, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১)। জীবনানন্দের বর্ণনায় আরও পূর্ণ হয়ে দেখা দেয় সেবা ও করুণার মনোভাবের সঙ্গে অনমনীয় দৃঢ়তার মিশ্রণে গঠিত কুসুমকুমারীর চেহারা। বরিশালের শীতের রাতে মা-র আসার অপেক্ষায় কীভাবে তাঁদের সময় কাটত বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, 'ভয় পেতাম, কোন পড়শীর বাড়ি থেকে ডাক আসতে পারে, কারু মারাত্মক রোগ হয়েছে, হয়তো কোন দুঃস্থ পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের আশ্রয় থেকে, হয়তো কোন নিম্নশ্রেণীর লোকের মৃত্যু হয়েছে, হয়তো কোন অনাথ স্ত্রীলোক বিশেষ কারণে বিপন্ন, হয়তো কোন প্রতিবেশীর ঘরে ছেলেপিলে হবে, ... মার কাছে খবর এসে পৌঁছলেই তিনি চলে যাবেন—সারা রাত বাড়িতেই ফিরবেন না হয়তো আর, জেগে বা ঘুমিয়ে একাই পড়ে থাকতে হবে আমাদের।' (উত্তরসূরি, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬১)। বাড়িতে শিশুসন্তান রেখে রাত্রিবেলা প্রতিবেশীর সমস্যা-সংকটে গিয়ে দাঁড়াবার মতো মহিলা এ-যুগেও অল্পই।

ঘরের গণ্ডির বাইরে এসে সামাজিক অনুষ্ঠানে মেয়েদের যোগ দেবার প্রচলন করেন প্রধানত ব্রাহ্ম-মহিলারাই। বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজে সমারোহের সঙ্গে পালিত হত বাৎসরিক মাঘোৎসব—উদ্‌যাপিত হত মনীষীদের স্মরণসভা। ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক সত্যানন্দ দাসের সভাপতিত্বে বরিশাল ছাত্রসংঘ নানারকম সভা ও জনকল্যাণমূলক কাজের আয়োজন করত। সপ্তাহকালব্যাপী মাঘোৎসবের একটি দিন নির্দিষ্ট থাকত মহিলাদের জন্য। সেদিন সভার সব কাজ পরিচালনা করতেন মহিলারাই। 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার 'স্থানীয় প্রসঙ্গ ও সংবাদ'-নামে নিয়মিত-বিভাগটিতে দেখা যায় ১৩১৯ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই সেই মহিলাদিবসের উপাসনায় আচার্যের কাজ করেছেন কুসুমকুমারী। পরিণত বয়সে এমন একটি স্বাভাবিক মর্যাদার অধিকারিণী তিনি হয়েছিলেন যে, শুধু মহিলাদের উৎসবে নয়, ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভাতেও কখনও-কখনও আচার্যের কর্মভার তাঁর ওপর অর্পিত হত। হেমন্তকুমারী লিখেছেন, 'আমার দিদি বহু বৎসর যাবৎ বরিশাল ব্রাহ্মিকা-সমাজের আচার্যের কাজ করেন, সম্প্রতি ভক্তিভাজন আচার্য মনোমোহনবাবুর তিরোধানে তিনি সমাজের আচার্যের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভক্তিভাবপ্রণোদিত সরস উপাসনা সকলের প্রাণকে আকৃষ্ট করিতেছে।' পূর্বোক্ত 'হাসির গান'-এর ভূমিকার অন্তর্গত এই উক্তির প্রকাশকাল ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। একথার সমর্থন পাই জীবনানন্দের কথাতেও : 'বাবা ও পিসেমশায়ের অবর্তমানে তিনি বরিশালের ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কাজ

করতেন। বেশ ঋজু, শান্ত, আত্মস্থ-ভঙ্গিতে বেদীর ওপর বসতেন ... কোথাও ঠেকতেন না—তাল কেটে যেত না—কোন পুনরুক্তি ছিল না—আমার cardinal Newman-এর কথা মনে হতো। বরিশালের কয়েকটি মাঘোৎসব তিনি এমনভাবে সন্দীপিত স্নিগ্ধ করে রেখেছিলেন।' (উত্তরসূরি, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬১)। শেষ-বয়সে কুসুমকুমারী যখন কলকাতায় থাকতেন তখনও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে মেয়েদের সভায় উপাসনা-কাজ পরিচালনা করেছিলেন।

আরও বহুবিধ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। 'ব্রহ্মবাদী' ১৩২১-এর ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা থেকে জানা যায় : ৩ ভাদ্র তারিখে বরিশাল ছাত্রী-সমাজের পক্ষ থেকে আয়োজিত আনন্দমোহন বসুর স্মরণসভায় কুসুমকুমারীর লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। মনে হয়, তিনি নিজে উপস্থিত থেকে প্রবন্ধটি পড়েননি। ঐ বছরেই অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় জানতে পারি : ইম্পিরিয়াল রিলিফ ফান্ডের সাহায্যকল্পে ১৭ নভেম্বর এক মহিলা-সভায় 'শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি. এ. এবং শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী যথাক্রমে সভানেত্রী-পঠিত প্রস্তাবের বঙ্গানুবাদ এবং স্বলিখিত ইংরেজী এবং বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করেন।' উত্তরোত্তর দায়িত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল কুসুমকুমারীর কাজ। 'ব্রহ্মবাদী', ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৪ সংখ্যার খবর : 'রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের কার্য এক বৎসরকাল বন্ধ ছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী[২] মহাশয়ের তত্ত্বাবধায়কতায় ইহার কার্য পুনরায় বগুড়াস্থ সর্বানন্দ-ভবনে আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রায় ২৫-টি বালকবালিকাকে ৩টি ক্লাসে নীতি, ধর্ম ও সঙ্গীতাদি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস, কুমারী স্নেহলতা দাস এবং কুমারী লীলাময়ী চক্রবর্তী এই স্কুলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।' ১৩২৯-এর কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'ব্রহ্মবাদী'তে বরিশালে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের শ্রীমন্মথমোহন দাস-রচিত বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে দেখতে পাচ্ছি : অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন মনোমোহন ও সম্পাদক ছিলেন সত্যানন্দ। মহিলা-সভার অধিবেশনে কুসুমকুমারী 'নারীজাতির কর্মক্ষেত্র ও কার্য'-বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। শুধু তাই নয়—'মহিলা যাত্রী-নিবাসের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস।' বরিশাল মহিলা-সমিতিও একটি পৃথক, সক্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত এই সমিতির সুযোগ্য সম্পাদিকা ছিলেন কুসুমকুমারী। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার ১৩৩২ পৌষ-সংখ্যায় তাঁর লেখা একটি বিশদ সম্পাদিকার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে—যেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের এই প্রিয় সমিতিও

[২]মনোমোহন চক্রবর্তী ছিলেন সত্যানন্দের ভগ্নীপতি—ব্রাহ্মসমাজের নিবেদিত কর্মী, 'ব্রাহ্মবাদী' পত্রিকার সম্পাদক। 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় 'বরিশালে পঁয়তাল্লিশ বৎসর' নামে তাঁর একটি তথ্যবহুল ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

আজ দু-বৎসর হইতে চলিল দশের কাজ করিবার জন্য ক্ষুদ্রশক্তি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিয়াছেন।' লেখাটি থেকে জানা যায় : এই নারীসমিতির কার্যসূচীতে ছিল, দরিদ্র ছাত্রীকে সাহায্য, ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষণের ব্যবস্থা, মাতৃনিকেতন প্রতিষ্ঠা, অন্তঃপুর নারীশিক্ষালয়, শিশু-প্রদর্শনী ইত্যাদি। আর-একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ দিয়েছেন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদিকা চারুবালা গুহ ও কুসুমকুমারী দাস 'বঙ্গলক্ষ্মী' বৈশাখ ১৩৩২-এ : 'গত আষাঢ় মাসে দেশপ্রাণা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও মাননীয়া শ্রীমতী সরলাদেবীর বরিশাল-আগমন উপলক্ষে সমিতির পক্ষ হইতে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া দুজনকেই অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইয়াছে।'

এইভাবে কুসুমকুমারী জড়িয়ে গিয়েছিলেন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের নানারকম ধর্ম, উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের সঙ্গে। এই কার্যধারার দীর্ঘকাল ব্যাপ্তি প্রমাণ করে তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতা। অবশ্যই সত্যানন্দ তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং পরিবার বাধা দেয়নি। তবু নিজের মনের মধ্যে মঙ্গলের সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও সবল সম্পাদনাশক্তি না থাকলে এ-ধরনের কাজ চালিয়ে যাওয়া শুধু অন্যের ইচ্ছায় বা সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে সম্ভব হয় না।

জীবনের অধিকাংশ সময় বরিশালে কাটালেও কোনো-সময়েই কোনো স্থানিক আবদ্ধতা তাঁর মনকে বাধাগ্রস্ত করেনি। কৈশোরে কলকাতায় থেকে বেথুন স্কুলে পড়েছেন, তারপর উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেছেন সন্তানের রোগ-নিরাময়কল্পে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কনিষ্ঠপুত্র অশোকানন্দ কর্মসূত্রে পুনায় থাকাকালীন সত্যানন্দ ও কুসুমকুমারী সেখানে গিয়েছিলেন। সত্যানন্দের ভাই ব্রহ্মানন্দের পণ্ডিতিয়া প্লেসের বাড়িতে বরিশাল থেকে মাঝে-মাঝেই আসতেন তাঁরা। কুসুমকুমারীর পুত্র অশোকানন্দ বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র ও কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের আবহাওয়া-বিভাগে চাকরি করতেন। কন্যা সুচরিতা ছিলেন তমলুকের একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ১৯৪২-এ অশোকানন্দ পুনা থেকে চলে আসেন ও দমদম, আলিপুর ও ব্যারাকপুরে কিছুদিন করে থাকেন। ১৯৪২-এর ২২-এ নভেম্বর সত্যানন্দের মৃত্যুর পর কুসুমকুমারী মূলত অশোকানন্দ ও তাঁর পত্নী নলিনী দেবীর কাছেই থাকতেন। ১৯৪৩-এর পর ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডে ছিলেন—যদিও বরিশাল যাতায়াতও অব্যাহত ছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর বয়সের ভার ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর বরিশাল যাননি। থাকতেন ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে। ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর মাসে সেই বাড়িতেই পরলোকগমন করেন।

কুসুমকুমারী দাসের এই জীবন-পরিচিতি রচনার কাজে যে-সব প্রকাশিত লেখা উৎসরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রবন্ধের মধ্যেই উল্লেখিত। প্রধান সহায়তা পেয়েছিলাম অশোকানন্দ দাশ ও নলিনী দাশের কাছ থেকে। কুসুমকুমারী সংক্রান্ত কিছু চিঠি, দুর্লভ কিছু বই ও প্রবন্ধ, কুসুমকুমারীর দিনলিপি ও স্মৃতিকথার কিছু অংশ অকৃপণ সৌজন্যে তাঁরা যথেচ্ছ ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই আজ প্রয়াত। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

কবিতার কথা

জীবনানন্দ দাশ তাঁর মা কুসুমকুমারীর কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন :

'...প্রথম জীবনে মা কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। যেমন—"ছোট নদী দিনরাত বহে কুলকুল" অথবা "দাদার চিঠি" কিংবা "বিপাশার পরপারে হাসিমুখে রবি ওঠে"। একটি শান্ত, অর্থঘন সুস্মিত ভোরের আলো, শিশির লেগে রয়েছে যেন এসব কবিতার শরীরে। সে-দেশ মায়েরই স্বকীয় ভাবনা-কল্পনাব স্বীয় দেশ। কোনো সময় এসে সেখান থেকে এদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না।' (আমার মা-বাবা, উত্তরসূরি, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)

জননীর কবিতা-সম্পর্কে পুত্রের এই উক্তির মধ্যে মিশে আছে বিনম্র শ্রদ্ধা। আমরা এখানে খোলা-চোখে খোলা-মনে কুসুমকুমারী-র কবিত্বশক্তির বৈশিষ্ট্য বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

'দিদি সুন্দর সুন্দর কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিতেন'—বলেছিলেন কুসুমকুমারীর ছোটো বোন হেমন্তকুমারী, তাঁর পিতা চন্দ্রনাথ দাস-সম্পর্কিত জীবনী-প্রবন্ধে (চন্দ্রনাথ দাসের 'হাসির গান' দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)। সেকালের মানদণ্ডে কুসুমকুমারীর কৈশোর-রচনা-প্রসঙ্গে এই উক্তি অ-যথার্থ নয়। বরিশালের প্রাথমিক পাঠ সাঙ্গ করে কলকাতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে, প্রথমে রামানন্দেরই গৃহে, পরে ব্রাহ্ম-বালিকা বোর্ডিঙ-এ থেকে বেথুন স্কুলে পড়েন কুসুমকুমারী। তখনও রামানন্দের উৎসাহে তাঁর কবিতা-রচনা অব্যাহত থাকে। বিবাহের পর বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বিদ্যানুরাগী পরিবেশে, স্বামী সত্যানন্দের সমর্থনে এবং ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার সম্পাদকের প্রয়োজনে অক্ষুণ্ণ থাকে তাঁর কবিতার ধারা।

কুসুমকুমারী কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। গুরুসদয় দত্ত তাঁর পরলোকগত পত্নী সরোজনলিনী দেবীর স্মৃতিতে এক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। বিষয় ছিল : নারীত্বের আদর্শ। কুসুমকুমারী স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতায়। এই-সংবাদ পাই 'ব্রহ্মবাদী'-পত্রিকার ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যাটিতে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় দুই সংখ্যায় (১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ

ও জ্যৈষ্ঠ)। এছাড়াও ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে 'পূর্ববাঙলা ব্রাহ্ম-সম্মিলনী'র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার ব্রহ্মমন্দিরে। সেখানে মহিলা-দিবসে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন কুসুমকুমারী। এ-সংবাদ পাই ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'ব্রহ্মবাদী'-তে। ঐ বছরের মাঘ-সংখ্যায় জানা যায় : বরিশালের মাঘোৎসবেও কুসুমকুমারী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সত্যানন্দের মাতা প্রসন্নকুমারী দেবীর শ্রাদ্ধসভায় কুসুমকুমারী পাঠ করেছিলেন প্রসন্নকুমারীর জীবনী-প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলি উল্লেখিত হলেও কোনো পত্রিকায় এগুলি পাওয়া যায়নি। সম্ভবত প্রকাশিতই হয়নি। 'নারীত্বের আদর্শ'ই তাঁর একমাত্র-প্রাপ্ত প্রবন্ধ বলে সেখান থেকে দুটি-অংশ উদ্ধৃত হল। এতে পাওয়া যাবে তাঁর জীবনাদর্শ, বিশ্লেষণী-চিন্তা ও সুদৃঢ়-প্রাঞ্জল গদ্যনির্মাণের উদাহরণ :

১. আদর্শ নারী পতিগৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও শান্তিবিধানে তৎপরা থাকিয়াও পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ ও দেশকে বিস্মৃত হইবেন না। যে সেবা, ত্যাগ, প্রেম, ধর্ম ও কর্ম তাঁহার জীবনকে সরস, সুন্দর, মধুর, পবিত্র ও জ্যোতির্ময় করিয়াছে তাহা কি শুধু গৃহকোণেই আবদ্ধ থাকিবে? তা নয়, নারীত্বের আদর্শে ও প্রেরণায় তাহা এক প্রাণ হইতে দশ প্রাণে, দশ প্রাণ হইতে শত-সহস্র প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজকে ও পতিকে, দেশকে ও দেশবাসীকে জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ ও সতেজ করিয়া তুলিবে।

২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবের নারীশক্তিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রাচ্যের শালীনতা, নম্রভাব, সতীত্ব-গৌরব, একনিষ্ঠা, ভগবদ্‌ভক্তি, সততা, স্বাভাবিকতা, অল্পে-তুষ্টি-প্রভৃতি গুণাবলী ও পাশ্চাত্যের কর্মশক্তি, নির্ভীকতা, সাহসিকতা, নিঃসঙ্কোচভাব, স্বাবলম্বন ও অন্যান্য সদগুণের অনুকরণে বর্তমান নারী-শক্তিকে সচল, সফল ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে। ...আমাদের দেশের নারীশক্তি এখনও নিদ্রিত, অবরোধ-রুদ্ধ। তাই ভারত অর্ধমৃত।

কুসুমকুমারীর প্রবন্ধগুলি সবই তাৎক্ষণিকের প্রয়োজনে লেখা। কবিতাতেই কুসুমকুমারী বেশি করে ঢেলে দিয়েছিলেন নিজেকে। যত লিখেছেন, মুদ্রিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। প্রধানত তাঁব কবিতা প্রকাশিত হয়েছে 'ব্রহ্মবাদী'-পত্রিকায়। অল্প-কিছু 'প্রবাসী' ও 'মুকুল'-এ।

বিষয়-অনুসারে তাঁর কবিতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমেই আসে ঈশ্বর ও ধর্মবিষয়ক কবিতা। কুসুমকুমারী তাঁর জীবনে পিতার ও স্বামীর গৃহে, শিক্ষাদীক্ষায় ও সমাজ-পরিবেশে আশৈশব ব্রহ্মের করুণাময় অস্তিত্বে দ্বিধাহীন বিশ্বাস স্থাপিত হতে দেখেছেন। কখনও সেই করুণায় সন্দিহান হবার কারণ ঘটেনি। ফলে তাঁর ঈশ্বর-সম্পর্কিত কবিতাগুলির মধ্যে মনোভাবের কোনো বিবর্তন নেই। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের মধ্যে যে বহুবিচিত্র স্তর-পরম্পরা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্পিত হয়—সেই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর ও বিরোধী ভাবের সমন্বয়-বৈচিত্র্য সাধারণভাবেই ব্রাহ্মধর্মে অনুপস্থিত। ঈশ্বরের কাছে সার্বিক আত্মনিবেদনই ব্রাহ্মধর্মের মূল ও প্রায় একমাত্র সুর। কুসুমকুমারীর কবিতাতেও এই

মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রার্থনা ও আবাহন খুবই সরল ভাষায় উচ্চারিত। ভাবনাও সহজ ও সুবোধ্য। যখন বিপন্নতা ও অসহায়তা, তখন তিনি স্মরণ করেছেন ঈশ্বরকে :

আজ এসময়ে এস তুমি এস
ব্যথাহারী ভগবান,
ডেকেছি যখন আসিবে তখন
অভয় করিবে দান।

—সুদূরের ডাক

ঔপনিষদিক প্রত্যয়-অনুসারে কুসুমকুমারীও ঈশ্বরকে বিঘ্নহরণ এবং আনন্দরূপে বিভান্বিত বলে অনুভব করেছেন :

সকল ব্যথা জুড়ায়ে দাও, তোমায় শুধু ডাকি
আনন্দময়রূপে তোমার ভুবন রাখ ঢাকি।

—প্রার্থনা

ব্রাহ্মধর্মের দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে নিসর্গভুবন ও মানবলোকের সার্বিক ব্যাপ্তিতে মূর্তিবিহীন এক পূর্ণতার উপলব্ধিরূপে অনুভব করা হয়। কুসুমকুমারীও জ্যোৎস্না, বিহঙ্গ-কূজন, ভোরের আলো, আকাশের তারার অস্তিত্বে ঈশ্বরের করুণাময় প্রকাশ অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে এই ভাবটিরই অপরূপ বাক্‌প্রতিমা আমরা পেয়েছি। আরাধ্য-ঈশ্বরের সেই অরূপ-রূপেরই স্বীকৃতি ও বন্দনা কুসুমকুমারীর লেখাতেও :

অন্তরালে আছ, তবু প্রতিবিম্ব তার
বক্ষে লয়ে দুলিতেছে সকল-সংসার
যার আঁখি পিপাসিত সেই জন হেরে
মহারহস্যের মাঝে চিন্ময় তোমারে।

—বিশ্বরূপ

কুসুমকুমারীর ঈশ্বর-নির্ভরতা কোনো-সময়েই বিচলিত হয়নি—তা আমরা অনুভব করি, যখন এক স্বস্থ সংসারের গৃহিণীর কর্মভার পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পালন করেও কবিতায় সংসারের চেয়ে তিনি ঈশ্বরানুভবকেই বড়ো করে দেখেছেন :

সংসার যাক সরে বহুদূর,
অন্তর আজ কর ভরপুর,
অনিত্যের মাঝে হে নিত্য-মধুর।
তোমাতে ডুবাও প্রাণ।

—শেষ দিনে

কিশোরবালক ও তরুণদের উদ্দেশে রচিত কবিতাগুলির জন্যই কুসুমকুমারীর সর্বাধিক পরিচিতি। 'মুকুল'-পত্রিকায় এগুলি প্রকাশিত হত। কিন্তু বিভিন্ন পাঠ্য-

সংকলনে গৃহীত হবার কারণে তাঁর 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটিই আমরা পড়েছি। সে-ক্ষেত্রেও মনে থাকে প্রথম-দুটি পঙক্তি মাত্র :

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ?

কবিতাটির শেষ-অংশে কবি এই কাজের ধারণাটিই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই 'কাজ' শব্দটি কোনো বিপুল কীর্তি, কোনো কালোত্তীর্ণ সাফল্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক কাজকেই কবি বুঝিয়েছেন—বলেছেন, সব কাজই মূল্যবান। প্রত্যেকে যদি নিজের কাজটি সৎভাবে মনোযোগের সঙ্গে করে তাহলে দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। কুসুমকুমারী দেবারাধনা আর কর্মপ্রাণনার মধ্যে কোনো ভেদ রাখেননি। তাঁর নিজের জীবনও ছিল এই বিশ্বাসেরই দৃষ্টান্ত। জীবনানন্দের উক্তি মনে পড়ে : 'বরিশালের বাড়িতে লোকসংখ্যা অনেক ছিল। জেঠিমা ও মাকে সারাদিন গৃহস্থালীর কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। ...কোনো রেহাই ছিল না। রেহাই তাঁরা চাননি, পরিশ্রমকে তাঁরা ভয় করতেন না, কর্তব্যবোধ পরিপূর্ণভাবে সজাগ ছিল, দায়িত্বকে এড়াবার কথা তারা ভাবতেও পারতেন না।' (আমার মা-বাবা। উত্তরসূরি, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটির শেষাংশে কুসুমকুমারী লিখেছেন :

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব-মাঝার,
হাতে-প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

কুসুমকুমারীর হৃদয়ে মানবসাম্যবোধের একটি আদর্শ ছিল। মনুষ্যত্বের বিচারে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ নেই—এ-কথাটি বারবার ছোটোদের জন্য লেখা কবিতায় তিনি তুলে ধরেছেন। 'কৃষক-শিশু' নামের দীর্ঘ কাহিনী-কবিতাটিতে তিনি দেখিয়েছেন : কীভাবে এক প্রফুল্লচিত্ত, নিরলস-কর্মী কৃষক-বালক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল এবং হয়ে উঠল দেশের সুশাসক :

দুঃখিনী ভারতভূমি, যদি তোর ঘরে-ঘরে
কর্মপ্রাণ শিশু হেন জন্মে বিধাতার বরে,
রবে না রবে না আর তোর এ মলিন ছবি
হাসিবে ভারতাকাশে বিমল সৌভাগ্যরবি।

'আদর্শ ছেলে' কবিতার ধরনে গম্ভীর ও আন্তরিক উপদেশাত্মক আরও-কিছু কবিতা (মনুষ্যত্ব, মানুষকে, স্বাবলম্বী, উদ্বোধন) লিখলেও ঈষৎ অন্য-ধরনের ছোটোদের কবিতাও লিখেছিলেন কুসুমকুমারী—যেখানে কর্তব্যবুদ্ধি নয়, শিশুদের স্বাভাবিক সহজ সুখ-দুঃখের অনুভূতিই প্রধান। 'দাদার চিঠি' উল্লেখযোগ্য। কলেজে পড়বার

জন্য এক কিশোর এসেছে কলকাতায়—'সিটি কলেজ খুললে আমি ভর্তি হব তথা।' প্রবাসে এসে তার সর্বক্ষণই মনে পড়ে মা-বাবা-সহ ছোটো-ভাইবোনদের কথা—গ্রামে থাকতে যাদের কথা সে তেমনভাবে কখনও চিন্তা করেনি :

বিদেশ এলে বুঝতে পারবে কেমন করে প্রাণ,
বুঝেছি ভাই, কাকে বলে এক রক্তের টান।

আর-একটি কবিতায় আছে শিশু ও তার পোষা তিনটি বিড়ালছানার স্নেহবন্ধনের লিপিচিত্র :

সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটি বিড়াল তার
এক-দণ্ড নাহি তাদের করবে চোখের আড়।

খোকা তার বিড়ালদের নাম রেখেছে 'সোনামুখী', 'সোহাগিনী' আর 'চাঁদের কণা'। কবিতাটির সুর হাল্‌কা—স্নেহসিক্ত ও মধুর। 'মুকুল'-এর সব-কয়টি সংখ্যার সন্ধান পাইনি। আরও-কিছু ছোটোদের কবিতা কুসুমকুমারী লিখেছিলেন। 'মুকুল'-এর ১৩২১ বঙ্গাব্দের কোনো সংখ্যায় 'প্রকৃতির দান' নামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাগারে ঐ-বছরের 'মুকুল' ছিন্ন-অবস্থায় থাকায় কবিতাটি পাওয়া যায়নি।

কুসুমকুমারীর হৃদয়ে পরাধীন স্বদেশের অবমাননা-জনিত বেদনাবোধ ছিল গভীর। তাঁর ছোটোদের জন্য লেখা কবিতাগুলিতে এই মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বারবার তিনি তরুণদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দুঃখী দেশ, 'দুখিনী ভারতভূমি'-র কথা। দেশের কল্যাণের জন্যই সচেষ্ট হবার আহ্বান জানিয়েছেন তাদের প্রতি। দেশের দুর্দশার জন্য বিদেশী শাসককে প্রধানত দায়ী না করে তিনি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন এদেশের মানুষের শ্রমবিমুখ, স্বার্থসংকীর্ণ, প্রাণশক্তিতে দুর্বল চরিত্রের প্রতি। ছোটোদের কাছে বারবার তাই সততার সঙ্গে, সমুন্নত-চিত্তে কর্মে প্রবৃত্ত হবার আহ্বানই তিনি জানিয়েছেন। একটি কবিতায় দুঃখের সঙ্গে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, ছোটোরা এদেশের বড়োদের কাছে প্রকৃত মহত্ত্বের কোনো আদর্শই পায় না। তাদের উন্নতচরিত্র হবার পক্ষে সেটাই সর্বাধিক বাধা :

একদিন লিখেছিনু, আদর্শ যে হবে
'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'।
আজ লিখিতেছি বড় দুঃখ লয়ে প্রাণে,
তোমরা মানুষ হবে কাহার কল্যাণে?
মানুষ গড়িয়া ওঠে কোন্ উপাদানে,
বাঙালি বোঝেনি তাহা এখনও জীবনে।

—মনুষ্যত্ব

কুসুমকুমারীর কাছে তাই দেশাত্ম-বোধক কবিতা-রচনা প্রত্যাশিত থাকে আমাদের। কিন্তু, তেমন-লেখা খুব-বেশি আমরা পাই না।

স্বাধীনতা-আন্দোলন-প্রসঙ্গে বা পুরোপুরি বিপ্লবের সুরে রচিত কবিতা তিনি লেখেননি। ব্রাহ্মসমাজের বাতাবরণ তার একটা কারণ হতে পারে। সাধারণভাবেই ব্রাহ্মসমাজ বেশি উৎসাহিত ছিলেন না সন্ত্রাসবাদে এবং ইংরেজ-বিদ্বেষজাত সক্রিয়তার উত্তেজনায়। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল : ধর্মভাবপূর্ণ-চরিত্রনির্মাণ ও চিত্তবৃত্তির উন্নতিসাধন। তাঁদের কর্মধারা মূলত প্রবাহিত ছিল অহিংসা, সৎকার্য, স্বাবলম্বন, অনাড়ম্বরতার পথে। তাই কুসুমকুমারীর কবিতাতেও সেটিই মূল সুর। কিন্তু কুসুমকুমারীর চরিত্রে এমন-একটা উদ্যমী সক্রিয়তা ছিল—ছিল আত্মমর্যাদাব্যঞ্জক দৃঢ়তা যে, পরাধীনতার তীব্র আত্মাবমাননা তাঁকে দিয়ে বিপ্লবমন্ত্রের দু-একটি কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত প্রবাসী থেকে 'মায়ের প্রতি' কবিতাটির কিছু-অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে :

তোমার বন্দিনী মূর্তি ফুটিল যখন
দীপ্ত দিবালোকে
সহস্র ভায়ের প্রাণ উঠিল শিহরি
ঘৃণা লজ্জা শোকে।
হিমাচল হতে দূর কুমারিকা পার
কাননে-প্রান্তরে
নগরে নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে-পল্লীতে
প্রাসাদে-কুটীরে,
কোটি-কোটি মৃত প্রাণ হোমাগ্নির প্রাণে
উঠুক জ্বলিয়া,
মা তোর তপসী-মূর্তি পূজিবে সন্তান
হিয়ারক্ত দিয়া।

কুসুমকুমারীর দেশভাবনারই অপর-এক প্রকাশ দেখি ভারতীয় মনীষীদের নিয়ে লেখা তাঁর কবিতায়। মহৎজনকে তাঁদের প্রাপ্য-শ্রদ্ধা অর্পণ করবার মনোভঙ্গি তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায়। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬০) গ্রন্থে বলেছেন : কুসুমকুমারী কবিতা লিখেছিলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। মুদ্রিত-রূপে কবিতাগুলি পাওয়া যায়নি। তাঁর খসড়ার খাতায় টুকরো-টুকরো কবিতাংশে এগুলির আভাস পাওয়া যায়। সেই লিখন-কণিকাগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। লক্ষ করবার বিষয় : রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে লেখা কবিতাতেও কুসুমকুমারী 'ত্রিশ কোটি মানবের বেদনা-লাঞ্ছনা'-র প্রসঙ্গটি না এনে থাকতে পারেননি।

কুসুমকুমারীর কবিতা-রচনার ক্ষমতা যতটা ছিল, আগ্রহ ছিল তার চেয়ে কম। আরও সময় ও চিন্তা ব্যয় করলে আরও অনেক লিখতে পারতেন। কিন্তু 'ব্রহ্মবাদী'-র

সম্পাদক মনোমোহন চক্রবর্তীর তাগিদ না থাকলে যা লিখেছেন তাও লেখা হয়ে উঠত না। তাঁর ছেলেমেয়েদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় : পত্রিকার প্রয়োজনে মনোমোহন এসে কবিতা চাইলেই তিনি সংসারের কাজ করতে-করতে চাহিদার কবিতাটি জোগান দিয়ে দিতেন। বলা বাহুল্য, এভাবে লিখলে সংখ্যা বাড়ে, কাব্যগুণ বাড়ে না। তাঁর একশ্রেণীর কবিতায় তা-ই হয়েছে। 'ব্রহ্মবাদী'-র প্রতি বছরের শুরুতে বৈশাখ-সংখ্যায় নববর্ষের আবাহনসূচক একটি কবিতা থাকত—তার অনেকগুলিই কুসুমকুমারীর লেখা। যেমন : নুতনবরণ (১৩২৩), বর্ষ-আশা (১৩২৩), নববর্ষ (১৩২৪), নববর্ষ (১৩২৫), বর্ষকামনা (১৩২৭), নববর্ষের প্রতি (১৩৩৩), নববর্ষ (১৩৩৬), নবীনের প্রতি (১৩৩৭), বর্ষশেষ (চৈত্র, ১৩৩৭)। একই বক্তব্য ও রচনাভঙ্গির এই কবিতাগুলির একটির থেকে আর-একটিকে আলাদাও করা যায় না। এ জাতীয় কবিতা সাধারণতই প্রথম শ্রেণীর হয় না। এগুলিও হয়নি।

কুসুমকুমারীর এই কবিতাগুলির প্রসঙ্গে কিন্তু একটি ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখযোগ্য। জীবনানন্দ ২-৭-৪৬ তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'মা অনেক কবিতা লিখেছেন। সে সব কবিতার সাদা ঝর্ঝরে শব্দ-নিক্কণ ও আশ্চর্য অর্থসঙ্গতি বরাবরই আমাকে প্রলুব্ধ করেছে ; কিন্তু তবুও আমি প্রথম থেকেই অন্যপথ ধরে চলেছি।' (ময়ূখ, শীত-গ্রীষ্ম, ১৩৬১)। কথাটি সত্যই, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে নয়। সকলেরই রচনাকর্মের একটি শিক্ষাপর্ব থাকে। সেই পর্বে তিনি তাঁর মা-র পথে দু-এক পা চলেছিলেন। মহৎ ব্যক্তিদের নিয়ে কিছু-কিছু কবিতা তিনি কাব্যরচনার প্রথম যুগে লিখেছেন (দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ : ঝরাপালক) ; আর লিখেছেন, 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় ১৩২৬-এর বৈশাখে 'বর্ষ-আবাহন' নামে কুসুমকুমারীর পরিবর্তে ঐ ছাঁচের একটি কবিতা। সম্ভবত এটিই জীবনানন্দের প্রথম-প্রকাশিত কবিতা।

জীবনানন্দ নিজে জানিয়েছেন আরও-একটি সুন্দর তথ্য, 'আমার মা-বাবা' প্রবন্ধটিতে। অল্পবয়সে তিনি মনীষী ও মহৎ ব্যক্তিদের চিন্তায় ও মহত্ত্বে সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারতেন না। তাঁর সংশয়ী চিত্তকে পরিবর্তিত করবার চেষ্টা করেছিলেন কুসুমকুমারী। বলেছিলেন, 'ওরকম করে হয় না ; আগে তাঁদের মহত্ত্বে বিশ্বাস কর ; মনের নেতিধর্মী প্রবণতাকে নষ্ট করে ফেল ; শুধু মহামানুষ কেন—যে-কোন মানুষ কতখানি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র অনুভব করতে শেখ।' তিনি মহাপুরুষদের নামের তালিকা করে দিয়েছিলেন ছেলেকে। জীবনানন্দ লিখেছেন, 'ধীরে-ধীরে অনেক অনুতর্ক-বিতর্কের পরে টের পেয়েছি সত্যিই তাঁরা মহৎ।' এই স্বীকারোক্তি চিনিয়ে দেয় সেই কবিকে, যিনি লিখেছিলেন, 'এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'—আর 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।'

কুসুমকুমারীর কবিতার ভাষা-ছন্দ সম্পর্কে খুব বেশি-কিছু বলার নেই। সাধু বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন—চেষ্টা করেছেন ভাষাকে সুবোধ্য ও ভাবানুগ রাখার।

কোনোরকম কারিগরি কুশলতার প্রবণতাও ছিল না। প্রায় সর্বত্রই তিনি ব্যবহার করেছেন মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের বিন্যাস। সেই সময়ে তাই ছিল অধিক প্রচলিত। পয়ার ও ত্রিপদীর ধরনেই পংক্তি-সজ্জা করেছেন কবিতার। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলিতে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু কলাবৃত্ত-ছন্দের মসৃণ, তরঙ্গায়িত ধ্বনি-সৌকুমার্য সৃষ্টি করতেও তিনি সক্ষম ছিলেন—তার দুটি নিদর্শন সংকলিত কবিতাগুলিতে আছে : 'মাঘোৎসব' ও 'নূতন'। 'মধু মাঘ মাসে/পুলকে-হরষে/সরস বঙ্গভূমি ॥ দেশে-দেশে তার/ধ্বনিছে আবার/পূত ওঁকার/ধ্বনি ॥'—ছয় মাত্রার কলাবৃত্তের সুন্দর উদাহরণ। 'পূত'-শব্দের দীর্ঘস্বরে দুই মাত্রা ধরবার সাহসও লক্ষণীয়। আবার 'দুঃখাতীত' কবিতায় তিনি দলবৃত্ত-ছন্দেরও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন—'দুঃখ তুমি/এসেছ আজ/ভিক্ষা নিতে/আমার কাছে।' (৪+৪+৪+৪)-ইত্যাদি।

কুসুমকুমারী-র ভাষা সম্পর্কে জীবনানন্দ কিন্তু একটি তাৎপর্যময় ইঙ্গিত দিয়েছেন 'উত্তরসূরি'র সেই প্রবন্ধটিতেই। তিনি লিখেছেন, 'মার মুখের ভাষা কিরকম প্রাণস্বরূপ ছিল, কত লোকগাথা ও প্রবাদের যথোচিত সংমিশ্রণে তির্যক উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বরিশালে যতদিন তাঁর উদ্যম ও কর্মপ্রবাহ অক্ষুন্ন ছিল ততদিন তা শুনেছি ;.বুঝেছি সে ভাষা ও বুলি প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মত মানুষগুলোকে নিখুঁতভাবে ধরতে পেরেছিল বলেই অমন সহজ পবিত্রতায় ন্যস্ত হতে পারত।' কলকাতা বা ঢাকার নগরগুঞ্জন থেকে দূরে প্রথমজীবন কাটিয়েছিলেন জীবনানন্দ। কুসুমকুমারীর সূত্রেই লোক-জীবনের নিবিড়-নৈকট্যে আর লোকায়ত অভিব্যক্তির অত কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন তিনি। যার ফলে তাঁর কবিতা অন্যান্য আধুনিক কবির থেকে একটা আলাদা চেহারা নিয়েছে। হতে পারে, কুসুমকুমারীর ভাষা-সম্পর্কে জীবনানন্দের এই উক্তি অনেকটাই শ্রদ্ধার্ঘ। তবু বাংলা কবিতায় নতুন যুগের স্রষ্টা কবিপুত্রের এই স্বীকৃতিটুকু উপেক্ষা করবার মতোও নয়। তবে জীবনানন্দ সম্ভবত কুসুমকুমারীর মৌখিক ভাষার কথাই স্মরণ করেছিলেন। কাব্যভাষার ক্ষেত্রে কুসুমকুমারী তৎকালীন প্রথা-প্রচলনকেই মেনে নিয়েছিলেন দেখতে পাই।

আজ বিশ-শতকের অবসানে বাংলা কবিতা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে কুসুমকুমারীর কবিতা-সম্পর্কে খুব-বেশি কিছু দাবি করার থাকে না। সরল, লক্ষ্যাভিমুখী এই কবিতাগুলি একটি নির্দিষ্ট হৃদয়ভাবকেই শুধু ব্যক্ত করেছে। কিন্তু বক্তব্যকে সমিল ও ছন্দোময় কিছু পংক্তিতে সাজিয়ে দেওয়াকেই কবিতা বলা হত—এমন-একটা যুগ বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। প্রতিভাময় ব্যতিক্রম মধুসূদনের কয়েকটি চতুর্দশপদী ছাড়া হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-সহ বাংলার কবিকুল যে অজস্র কবিতা উনিশ শতকের শেষ তিরিশ বছর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ-পনেরো বছর ধরে রচনা করেছেন—তা এর বেশি আর কী? কুসুমকুমারীর কবিমানস এই কক্ষপথেই আবর্তিত এবং এই মানদণ্ডে তাঁকে মস্ত-বড় লেখিকা না বললেও

অসার্থকও বলা চলে না। এই মানসিক প্রত্যাশা আ-মূল বদলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজ বাংলা সাহিত্যের যে-কোনো পত্রিকায় তরুণতম কবির দুর্বলতম কবিতাটিতেও দেখি : লক্ষ্যভেদ হয়তো সবসময়ে করতে পারছেন না— কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম বোধ-বিন্দুটিকেই লক্ষ্য করে সেই কবির শরসন্ধান। বিবরণ বা উপদেশে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। এ-সবই রবীন্দ্রনাথের জন্য।

গত শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছর সাহিত্যচর্চা করেছেন যে বাঙালি-মেয়েরা এবং যে-ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা অগ্রণী হয়ে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন—তাঁদেরই একজন ছিলেন কুসুমকুমারী। মহাযুদ্ধোত্তর জটিল জীবনবোধ তখনও স্বাভাবিক হয়ে যায়নি, স্বীকৃত হয়নি শাস্ত্রসংস্কারহীন মানবিকতার নতুন মূল্যচেতনা। অথচ উনিশ শতকীয় প্রশান্তিবোধ থেকেও তাঁরা স্খলিত। যুগের চেহারা তাঁদের প্রত্যাশার সঙ্গে ঠিক-ঠিক মিলছে না বলে তাঁদের মনে রয়েছে অস্বস্তি। তাই তাঁদের লেখায় এত কাজ করবার আহ্বান—মহৎ আদর্শের ছবি, ঐশিক করুণা ও মানব-মহিমায় বিশ্বাস রেখে সুস্থ পৃথিবীর আশায় বসে থাকা। তাই তাঁদের লেখায় আশা ও আহ্বান যতটা, শান্তি ও তৃপ্তি ততটা নেই। তিক্ততা না থাকলেও বেদনা আছে। সময়ের পরিবর্তনকে অন্তরে নিতে পারেননি তাঁরা—বদলে-যাওয়া পৃথিবীকে তাঁদের স্বদেশ মনে হয়নি। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতায় যতই থাকুক জ্বালা-যন্ত্রণা, বিদ্রোহ-বিক্ষোভ—এক-ধরনের স্বস্তিও কিন্তু আছে। এই ভাঙনের যুগই আমার যুগ—এমনই একটি নৈকট্যবোধ, প্রবলতম সমালোচনার সঙ্গেও জড়ানো একটু প্রীতিপক্ষপাতের সুর। কুসুমকুমারীরা প্রকৃত অর্থেই এক বিলীয়মান যুগের কবি—যাঁরা শৈশব-কৈশোরে দেখেছিলেন স্থিত-পৃথিবী, পরিণত-বয়সে দেখেছিলেন শুধু অন্ধকার। তাই তাঁদের ঈশ্বরভক্তি আর দেশভাবনায় কবিতায় একটি অসহায়তার সুর বাজতে থাকে। আধুনিক কবিরা বেঁচে থাকার নিয়মেই অর্জন করেছিলেন নতুন আলোক-সন্ধানের শক্তি। কিন্তু কোনো নবদিগন্ত উন্মোচিত হবার অবকাশ ঘটেনি কুসুমকুমারীর জীবনে। তাই তাঁর ১৯৪১ সালের দিনলিপিতে আটষট্টি বছর বয়সে লেখা কবিতাটি বড় করুণ মনে হয় :

জগৎ-জননী আজ আসিছেন ঘরে
কোথা বাড়ি কোথা ঘর,
পথে ও প্রান্তরে
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, জন
আজি পাতিয়াছে তার ধুলায় আসন

বলা নিষ্প্রয়োজন, কুসুমকুমারী খুব বড় লেখিকা নন। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমযুগে যে-মেয়েরা সারাজীবন সাহিত্যসাধনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখেছিলেন—তিনি তাঁদেরই একজন। সাহিত্যরুচির একটি একান্ততা ছিল তাঁদের মধ্যে। নিজেদের

জীবন ও সমাজ-পরিবেশ থেকে একটি আদর্শ তাঁরা ছেঁকে নিতেন এবং লেখায় তাকে রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। লেখার মধ্যে দিয়ে উচ্চভাব প্রকাশ করতে হবে— বঙ্কিমযুগের এই প্রতিষ্ঠিত ধারণার তাঁরাই ছিলেন শেষ বাহক। এই দিকটি মনে রেখে কুসুমকুমারীর সাহিত্যসাধনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রহণ করলাম। এই সিদ্ধান্তে আমরা অবশ্যই পৌঁছতে পারি : রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, সমকালের নিরিখে তাঁর কবিতার মান আরো অনেকের মতোই ছিল। তাঁর কবিতায় বিশ-শতকের প্রথমার্ধের শিক্ষিত, স্বস্থ, চিন্তাশীল এবং নিজস্ব জীবনবোধ-সম্পন্ন এক নারী-মানসের ও কবিপ্রাণের পরিচয় পাই। বলা-বাহুল্য, তা-ও খুব কম প্রাপ্তি নয়।

সেপ্টেম্বর ২০০১ সুমিতা চক্রবর্তী

কবিতাবলী

দাদার চিঠি

আয় রে মনা, ভুতো, বুলী আয় রে তাড়াতাড়ি,
দাদার চিঠি এসেছে আজ, শুনাই তোদের পড়ি।
কল্‌কাতাতে এসেছি ভাই কাল্‌কে সকাল বেলা,
হেথায় কত গাড়ি, ঘোড়া, কত লোকের মেলা।

পথের পাশে সারি সারি দু-কাতারে বাড়ি
দিন রাত্তির হুস্‌-হুস্‌ করে, ছুট্‌ছে রেলের গাড়ি।
আমি কি ভাই গেছি ভুলে তোদের মলিন মুখ।
মনে পড়লে এখনো যে কেঁপে ওঠে বুক।

সেই যে মায়ের জলে-ভরা স্নেহের নয়ন দুটি
সেই যে আমার হাতটি ছেড়ে দিতে চায়নি পুঁটি—
ভুতো মনার আবদেরে ভাব 'দাদা, কোথায় যাবে?
যদি তুমি যেতে চাও তো সঙ্গে মোদের নেবে'।

সেই যে বুলী ঠোঁট কাঁপায়ে চুলের গোছা ছেড়ে
'যেতে নাহি দিব' বলে দাঁড়ায়েছিল দোরে—
সেই সে মলিন স্টেশন ঘরে চোখে কাপড় দিয়ে
কাঁদছিলি তুই হাতখানি মোর তোর হাতেতে নিয়ে।

সে সব কথা মনে পড়ে চোখে আস্‌ছে জল
দিনে দিনে কমে যাচ্ছে ভরা বুকের বল।
এসব কথা মায়ের কাছে বোলোনাকো ভাই,
আজকে আমি এখান হতে বিদায় হতে চাই।

আর এক কথা, নিয়মমতো লিখো আমায় চিঠি
কেমন আছে ভুতো, মনা, বুলী ছোট পুঁটি?

মা বাবাকে প্রণাম দিয়ে বল্‌বে আমার কথা,
সিটি কলেজ খুল্‌লে আমি ভর্ত্তি হব তথা।
দু-চার দিন আর আছে বাকি, ভালো আছি আমি
আমার হয়ে ভাইবোন্‌দের চুমু দিয়ো তুমি।
বিদেশ এলে বুঝ্‌তে পারবে কেমন করে প্রাণ
বুঝেছি ভাই, কাকে বলে এক রক্তের টান্‌।

এখন আমার চোখের কাছে যেন জগৎখানা
ভাস্‌ছে নিয়ে ভুতো, পুঁটি, বুলী, ননী, মনা।

মুকুল, কার্ত্তিক ১৩০২

খোকার বিড়াল ছানা

সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটি বিড়াল তার,
একদণ্ড নাহি তাদের করবে চোখের আড়।
খেতে শুতে সকল সময় থাক্‌বে তারা কাছে,
না হলে কি খোকামণির খাওয়া-দাওয়া আছে?
এত আদর পেয়ে পেয়ে বিড়াল ছানাগুলি,
দাদা, দিদি, মাসি, পিসি, সকল গেছে ভুলি।
সোনামুখী, সোহাগিনী, চাঁদের কণা বলে
ডাকে খোকা, ছানাগুলি যায় আদরে গলে—
'সোনামুখী' সবার বড় খোকার কোলে বসে
'সোহাগিনী' ছোট যেটি বসে মাথার পাশে
মাঝখানেতে মানে মানে বসে চাঁদের কণা
একে একে সবাই কোলে করবে আনাগোনা।

মুকুল, অগ্রহায়ণ, ১৩০২

আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?
মুখে হাসি, বুকে বল তেজে ভরা মন
'মানুষ হইতে হবে'—এই তার পণ,
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ?
হাত, পা সবারি আছে মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়?
সে ছেলে কে চায় বল কথায়-কথায়,
আসে যার চোখে জল মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ—
'মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন'।
কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার,
হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

মুকুল, পৌষ, ১৩০২

মনুষ্যত্ব

একদিন লিখেছিনু আদর্শ যে হবে
'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'।
আজ লিখিতেছি বড় দুঃখ লয়ে প্রাণে
তোমরা মানুষ হবে কাহার কল্যাণে?
মানুষ গড়িয়া ওঠে কোন্ উপাদানে ;
বাঙালি বোঝেনি তাহা এখনো জীবনে—
পুঁথি হাতে পাঠ শেখা—দু-চারটে পাশ
আজিকার দিনে তাহে মিলে না আশ্বাস,
চাই শৌর্য, চাই বীর্য, তেজে ভরা মন
'মানুষ হইতে হবে' হবে এই পণ—
বিপদ আসিলে কাছে হবে আগুয়ান
দুই খানি বাহু বিশ্বে সবারি সমান—

দাতার যে দান তাহা সকলেই পায়
কেউ ছোট কেউ বড় কেন হয়ে যায়!
কেন তবে পদতলে পড়ি বারবার?
'মনুষ্যত্ব' জাগাইলে পাইব উদ্ধার—।
যত অপমান, যত লাঞ্ছনা পীড়ন
একতার বলে সব হইবে দমন!
তেজীয়ান, বলীয়ান সেই ছেলে চাই
সোনার বাংলা আজি হারায়েছে তাই।
আবার গড়িতে হবে বীর শিশুদল,
বাংলার রূপ যাহে হবে সমুজ্জ্বল—

মুকুল ১৩০৩-১৩১১?

মানুষ কে

আছে প্রাণ, আছে দান, আছে ভালোবাসা
ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, চিত্তে আছে আশা।
পরের কারণে স্বার্থ করে বলিদান,
সেই তো মানুষ ভবে, সেই মহাপ্রাণ।
ধন, জন, মান, যশ কিছুই না রবে,
মানুষ যে তারি কীর্তি উজ্জ্বল রহিবে।
সে চাহে না কোনো কিছু, শুধু দিতে চায়,
বিধাতার অংশ রূপে জন্ম এ ধরায়।
নিঃস্বার্থ, নীরব কর্মী শুধু পরহিত
আপনারে বিলাইয়া সেজন বঞ্চিত—
তাহার সঞ্চিত ধন বিধাতার বরে,—
মানব-কল্যাণ-যজ্ঞে নিরন্তর ঝরে।
সে যেন গো ধরণীর ধ্রুবতারা হয়ে
দিকভ্রান্তজনে পথ দেয় দেখাইয়ে।
লাভ, ক্ষতি, ভালো, মন্দ কিছু সে জানে না
জাতিবর্ণ নির্বিশেষে কল্যাণ কামনা
তাহার জীবন ব্রত, নাহি কোনো বাধা
মহা মানবত্বে তার প্রাণখানি সাধা।

মুকুল, ১৩০৩-১৩১১?

স্বাবলম্বী

আপনার পায়ে দাঁড়াতে যে পারে,
কোনো শক্তি নাই বধিবে তাহারে,
নিজ হাতে যার রয়েছে সম্মান—
কোন্ মানী তারে করে অপমান?
আপনার জ্ঞানে প্রদীপ্ত প্রতিভা,
কোন্ জ্ঞানী তার কমাইবে প্রভা?
ত্যাগমন্ত্রে যার শিক্ষা নিরন্তর
স্বার্থ-ভীত নয় তাহার অন্তর,
মনুষ্যত্ব যার মন্ত্র জীবনের
সেই শুধু বোঝে দুঃখ অপরের,
সম্পদ, ঐশ্বর্য, বিভব ধরার
এ সকলে চিত তৃপ্ত নহে তার
মানুষের মতো মানুষ যেজন
সেই জানে জন্ম কিসের কারণ।
পরম আত্মার সন্ধান লাগিয়া
সতত ব্যাকুল সেই দেব-হিয়া।

, ১৩০২-১৩১১?

উদ্বোধন

বঙ্গের ছেলে-মেয়ে জাগো, জাগো, জাগো,
পরের করুণা কেন শুধু মাগো—
আপনারে বলে নির্ভর রাখ
হবে জয় নিশ্চয়—
চারিদিকে হের কি দুঃখদুর্দিন,
কত ভাই বোন অন্ন-বস্ত্র-হীন,
সোনার বাংলা হয়েছে মলিন
কি দারুণ বেদনায়—
তোমরা জাগিয়া দুঃখ ঘুচালে,
সকলের ব্যথা সকলে বুঝিলে
ত্যাগ, একতায় জাগিয়া উঠিলে,
তবে বঙ্গ রক্ষা পায়।

পৃথিবী জুড়িয়া যত অভিযান
সকলেই চায় দেশের কল্যাণ (সম্মান)
জননী জন্মভূমির উত্থান,
মানুষ যে সে-ই চায়।

মুকুল, ১৩০২-১৩১১?

দেব-মাধুরী

সংসার-আহ্বান ভুলে
প্রান্তরের শ্যামকোলে
তরুণ যোগিনী বালা ধেয়ানে মগন।
ভূমে রাশি ফোটা ফুল,
ঊর্দ্ধে হাসে তারাকুল,
চুম্বিছে শিশির-জল পুষ্পিত চরণ।
ছুটিছে কুসুম-বাস,
চূর্ণ কুন্তলের পাশ
এলায়ে পড়েছে বুকে, রক্তিম কপোলে ;
কম্পিত হৃদয়খানি
দেবতার পানে টানি
উদ্দেশে কাতর বাণী, মাখা অশ্রুজলে।
সুদূর স্বরগ হতে
পুষ্পবৃষ্টি এ নিশীথে,
সসম্ভ্রমে এ সুরবালা নীরবে দাঁড়ায়ে ;
সমীর যেতেছে ভাসি
সুধাংশু-কিরণ-রাশি,
খেলিছে জোছনা হাসি, দেহ আলিঙ্গিয়ে।
এ মধু যামিনী ঘোরে
কে গো দেবি! জোড়করে
বিশ্বের অতীত প্রাণ করিছ বরণ?
বাসনা, কামনা দূরে
বসি এ বিজন পুরে—
দেবের সংগীত ঝরে, স্তম্ভিত ভুবন।

নলিনী-নিন্দিত মুখ
বিশ্বপ্রেমে ভরা বুক—
অস্ফুট, নীরব ওষ্ঠ পরিমল ভরা ;
দেব-ভাব জাগাইয়া
প্রাণ, মন মোহনিয়া
বলে দেয় দেব-প্রেমে তুমি আত্মহারা।
নাই সংসারের জ্ঞান,
তোমার আরাধ্য প্রাণ,
অদূর মিলন-স্রোতে, এল তব কাছে ;
বিস্মিত জগৎ-নেত্র পরকাশি আছে।
বিশ্বদেবতার প্রিয়।
হিয়া মোর অতি হেয়
জীবন-সংগীত-স্রোত, চির নির্বাপিত ;
কি মনো-মন্ত্র-বলে
বিস্মৃত হৃদয়-তলে
জাগালে স্বপন-স্মৃতি? প্রাণ বিমোহিত!

বামাবোধিনী, মে ১৮৯৬ (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩)

বন্দনা

বিশ্ব আঁধার ভেদিয়া করে বন্দনা
নবীন রক্ত তপন মহান আলোকে।
গরজি গভীর স্বননে ধায় পারাবার
চুমিতে চরণতল অতুল পুলকে!
বনে উপবনে ফোটে কত ফুল
শিশিরসিক্ত নব-লাবণ্যে ভরিয়া
পরিমল শোভা সকলি বিকশি উঠে
তব মধুর পরশ লাগিয়া
দিগ্‌দিগন্তে চুমিয়া বহে সমীরণ
কাহারে খুঁজিছে সে দিশেহারা?
শান্ত উদার গগনে, অযুত-অযুত তারকা
কৌতুকভরে নেহারে কাহারে তারা?
কুলকুলু নাদে তটিনী ছুটিছে
তার বক্ষে বিপুল বাসনা

প্রেম-পাগল হিয়াখানি আজি
ওই চরণে করিবে লগনা।
গীতগন্ধ ছন্দোময় বিশ্ব
কত বন্দন পাঠায় তোমারি কাছে।
ওগো গম্ভীর, ওগো সুন্দর, ভুবনবাঞ্ছিত
কি দিবে দীন, শুধু করুণা যাচে।

ব্রহ্মবাদী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩০৮

অন্তরবাসিনী

ওগো অন্তরবাসিনি!
মর্মে-মর্মে উঠিছে ধ্বনিয়া
শোন কি আকুল বাণী,
ওগো অন্তরবাসিনি।
মোর সজন নিজন বিরহ বিজন
শূন্য শয়ন-মাঝ,
শুধু নয়নপ্রান্তে ঝরে আঁখিজল,
শূন্য দিবস গনি।
পাই পাই বলি ধরিবারে যাই
কিছু না মিলে যে হায়!
শরম-ক্লান্ত কুণ্ঠিত বাণী
মরমে লুকায়ে যায়।
লাঞ্ছিত প্রাণ দীর্ঘ হুতাশে
আবার ফিরায়ে আনি
ওগো অন্তরবাসিনি!
শ্রাবণমেঘের রৌদ্র মনে
ক্ষণেক হাসাবে যদি,
চির-বরষার আঁখি-জলভার
বহিব কি নিরবধি?
জান তুমি জান অন্তর-ব্যথা
অন্তর হতে কি দীন বারতা
দিবস-রাত্র চরণে তোমার
লুণ্ঠিত হয়ে আছে;
জান তুমি জান ভিখারি হৃদয়
কি তব করুণা যাচে।

নবীন প্রভাত শুভ্র আলোক,
পুলক-মগনা ধরা,
পাখি গায় গান, কুসুমের ঘ্রাণ
বায়ু সাথে দিশেহারা।
মোহন ছন্দে বিশ্ব-কবিতা
তোমারি আরতি করে,
এ শুভ লগনে রাখ গো চরণে
হে আমার ধ্রুবতারা।
আমি অসীম শূন্যে তৃষিত চকোর
শুষ্ক কণ্ঠে ডাকি,
হে সুধা-সাগর, ঢাল সুধাধার,
আজিকে রেখ না বাকি।

ব্রহ্মবাদী, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩০৯

কর্মনিষ্ঠা

অশ্রু যদি নয়নের শোভা না বাড়ায়
থাক রুদ্ধ ; মুখে কেন করি হায় হায়
ব্যথা দিতে?—অপরের বাড়াইতে ভার
জন্ম মোর!—নহে তাহা ইচ্ছা বিধাতার।
সংসারে যে ফুল ফোটে আমি গন্ধ লয়ে
মরিলেও ধরণীর সম্মান বাড়ায়ে
লভে সে বিদায় ; কর্ম-প্রাণ—শূন্য নয়
সে দেখে এ ধরা তার মাথার উপর
পাষাণের চাপা ; যার আছে প্রাণ
বিশ্ব তার বৈতরণী ; কি মহা নির্বাণ
শ্রবণে পশিছে তার,—জননী ধরণী
নহে-নহে জড়পিণ্ড, কর্মিষ্ঠা যোগিনী
নিষ্কাম সন্ন্যাস ব্রত করেন পালন ;—
কেমনে দেখিবে তাহা অন্ধের নয়ন।

ব্রহ্মবাদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

কৃষক শিশু

বিপাশার পরপারে হাসিমুখে রবি ওঠে,
এপারে আলোক পেয়ে বসে বসে ফুল ফোটে।
প্রভাত সমীর লাগি, নদীজলে ছোটে ঢেউ,
বিজন তটিনীকুল, গোনে না একটি কেউ।
সবুজ গ্রামের বুকে পাতা লতিকার গায়
রাখিয়া মুকুতামালা উষারানী চলে যায়।
শূন্যে সাঁতারিয়া রবি দূর দূরান্তরে যায়,
সহস্র সোনালি রশ্মি তারি পিছু-পিছু ধায়।
প্রভাতের সাড়া পেয়ে চমকি উঠিল পখি,
উন্মাদিয়া প্রাণ মন গাহে গান থাকি থাকি।
সারানিশি হেঁটে-হেঁটে প্রভাতে অবশ দেহ
নিরাশ্রয় পরবাস, হেথা কি মিলিবে স্নেহ?
চারিদিকে ছোট খাল, মাঝে তার ক্ষেতখানি
তরুণ কণ্ঠের সুর, না দেখি একটি প্রাণী।
সেকি কথা? ওই পথে যতদূর দৃষ্টি যায়।
শুধু ভরা ধানক্ষেতে, কিছুই না দেখা যায়।
ধনধান্য-শীর্ষগুলি তবে কেন নুয়ে পড়ে?
'কে হোথা?' 'কৃষকশিশু, কে পথিক ডাক মোরে?
অনাথিনী মা আমার, আমি শিশু পুত্র তার,
কাটিতে এসেছি ধান যবে ছিল অন্ধকার।"
বলিলাম 'ভয় নাই?' 'কেন ভয় পাব আজ,
দিন, মাস, বর্ষ ধরি করিতেছি, এই কাজ।
কাটিতে কাটিতে ধান শ্রান্ত হলে যাব ঘরে
আঁচলে মুছায়ে ঘাম, খেতে দেবে মা আমারে।
আবার আসিব ক্ষেতে, একাকী কাটিব ধান,
ফিরিব সাঁঝের কালে, গাহিয়া গাহিয়া গান।'

* *

কোমল লাবণ্য মাখা ঢল-ঢল মুখখানি,
হাতে কাজ প্রাণে বল মুখে তার সুধাবাণী।
দণ্ড দুই চেয়ে থাকি, নয়নে আসিল জল
বলিলাম 'কার ছেলে? কি নাম তোমার বল।'
'আশাময় কৃষকের আমি এক মাত্র সুত
অশোক বলিয়া মাতা ডাকে মোরে অবিরত।

সেই নামে পরিচিত কৃষকের পল্লী মাঝে,
অদূরে কুটির ওই মাতা সেথা নিজ কাজে।
হোথা মোরা দুই জনে থাকি সুখে বারোমাস
এর বাড়া কোনো সুখ, কখনো করি না আশ।'
সরল এ শিশু প্রাণ, বুকে তার কত বল,
হাসিতে হাসিতে খাটে নয়নে ঝরে না জল।
তৃপ্ত আশা সুখী প্রাণ, বেশি কিছু নাহি চায়
বিধাতা দেছেন যাহা, তাতে সুখে দিন যায়।

* *

মঙ্গল মুহূর্তে আজি কর্ম মন্ত্রে দীক্ষা লয়ে,
আলিঙ্গিয়া বালকেরে চলিলাম তরী বেয়ে।
আপনার দেশে গিয়া খাটিব দশের কাজে—
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ আর কি জগতে আছে?
দিন মাস বর্ষ যায় সহসা পড়িল মনে,
কই সে কৃষক শিশু? আজি বেলা অবসানে
আবার ছাড়িনু দেশ, ছোট তরী বেয়ে বেয়ে
একদিন সন্ধ্যাশেষে বিপাশার তীরে গিয়ে
বাঁধিলাম তরীখানি। নিরজন গ্রামে পথে
কত লোক আসে যায়, সেই ছোট ধান ক্ষেতে
বসেছে বিশাল হাট, কত পণ্য বীথিকায়
শোভিত সুন্দর গ্রাম। আপনার মহিমায়
'আশা গ্রাম' নামে এবে হইয়াছে পরিচিত,
চারিদিকে উথলিত কৃষক কণ্ঠের গীত!
কৃষকের নব রাজা 'অশোক কুমার' নামে,
পালিতেছে দীন প্রজা সুখে ভরা আশা গ্রামে।
প্রভাতে সন্ধ্যায় কত কৃষকের শিশু মিলি
তাহারি অমল যশ গাহিছে দু-হাত তুলি।
আবার নয়নে মোর আনন্দের অশ্রু জল
পুলকে শিহরে প্রাণ, হৃদয়ে নূতন বল
বিপাশার শান্ত কূলে হল নিশি অবসান,
তরুণ রবির করে ফুটিয়া উঠিল গ্রাম।
তেমনি ললিত লতা তরু কোলে হেলে দোলে
নিরমল নদী বুকে ছোট ছোট ঢেউ খেলে।
সবুজ গাছের ডালে বনের বিহগকুল
আপনার মনে গায়, সুরে তার নাহি ভুল।

সবি আছে তবু কেন শূন্য-শূন্য লাগে প্রাণ?
কোথা সেই ধানক্ষেত? শিশু কণ্ঠে মৃদু গান?
দেখিনু প্রাসাদ এক সেই যে কুটির 'পরে
সম্মুখে কুসুম বন ফুল ফুটে থরে থরে।
করুণা-পবিত্র সেই পরিচিত হাসি মুখ,
দাঁড়াল নিকটে আসি উছসি উঠিল বুক,
'কে পথিক, কোথা যাও? এস এই গৃহ মাঝে
দু-দণ্ড বিশ্রাম লভি যেয়ো আপনার কাজে'
জীবন্ত স্নেহের উৎস বিশাল দুইটি আঁখি
কোন্ দেব শিল্পী যেন নিরজনে গেছে আঁকি
রক্তিম অধর টুটি ফুটিছে স্বর্গের ভাষা
জড়িত তাহারি সাথে সে দেশের প্রেম, আশা।
চিনিল না সে আমারে, আমি চিনিলাম তায় ;
মঙ্গল প্রভাতে যবে দেখা হল দু-জনায়,
যতনে তাহার স্মৃতি গাঁথিয়া রেখেছি প্রাণে,
ভুলিতে পারিব কিরে জীবনের অবসানে?
রে লক্ষ্মী বিপাশা সতি, তোর এই পুণ্য কূলে
সৌভাগ্য হবে না অস্ত কোনো দিন কোনো কালে।
দুঃখিনী ভারত-ভূমি, যদি তোর ঘরে ঘরে
কর্ম-প্রাণ শিশু হেন জন্মে বিধাতার বরে
রবে না রবে না আর তো এ মলিন ছবি,
হাসিবে ভারতাকাশে বিমল সৌভাগ্য রবি।

মুকুল, দশম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১১

ভিখারিনী মেয়ে

আমি এক ভিখারিনী মেয়ে,
        সংসারে কিছুই নাই আর,
ওই যে তটিনী বহে, দু-কূল চুমিয়া
        তারি তীরে সমাধি মাতার।

সারাদিন বনে-বনে ঘুরি,
        শত ফুল করিয়া চয়ন,

সযতনে গাঁথি ফুল হার,
নদী জলে দিই বিসর্জ্জন।

কি জানি গো যদি এই দানে,
দেবতারা প্রসন্ন হইয়া,
প্রেতলোক হতে মা-র প্রাণ,
সুরলোকে যান্ গো লইয়া।

তাই শুধু, তাই শুধু আমি,
অতি শুভ্র, পুষ্প নিরমল
দেবতার উদ্দেশে ভাসাই,
বয়ে নিয়ে যায় নদীজল।

'শ্রাদ্ধ' 'পিণ্ড' যাহা তোমাদের
ভিখারিনী পাবে তাহা কোথা?
কড়ি নাই সম্বল আমার,
ফুল দানে ঘুচাই সে ব্যথা।

বল তো জগৎবাসি, বল একবার,
পবিত্র কি আছে এর চেয়ে?
কড়ি হীন পারে না করিতে
'মাতৃশ্রাদ্ধ' বন ফুল দিয়ে?

মুকুল, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩১১

নিবেদন

প্রভু, এই তব বিচিত্র ভুবন,
আমরা তোমারি প্রজা
প্রাণের ভকতি, নিরমল প্রীতি
লহ নিখিলের রাজা।

তুমি সেনাপতি, সৈন্য আমরা
তোমারি নির্দেশ শিরে,

হব আগুয়ান, লক্ষ্য মহান
পালিব জীবন ভরে।

প্রলোভন কত, দাঁড়াবে সম্মুখে,
অভয় পতাকা তব ;
যাত্রার পথে, জয় পরাজয়ে
জাগাবে শকতি নব।

হাতে দাও কাজ, মুখে রাখ হাসি,
প্রাণে তব বরাভয়,
সার্থক দান, সার্থক প্রাণ
কর গো করুণাময়।

মুকুল, দশম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩১১

মায়ের প্রতি

তোমার বন্দিনী মূর্তি ফুটিল যখন,
দীপ্ত দিবালোকে,
সহস্র ভায়ের প্রাণ উঠিল শিহরি,
ঘৃণা, লজ্জা, শোকে।
পবিত্র বন্দনমন্ত্রে কম্পিত বাঙলা
দূর আর্য ভূমি !
মুক্তকণ্ঠে যুক্তকরে ডাকিছে তোমায়,
হে লজ্জাবারিণী—।
সাধনার ধন তুমি ভারতবাসীর,—
সহস্র পীড়নে,
উপবাসে, অনশনে ভোলে নাই তোমা।
দুর্বল সন্তানে
দিব্য মন্ত্রে দিব্য স্নেহে দাও স্থান আজি
মন্দিরে তোমার ;
যায় যাক্ থাক্ প্রাণ, সে মন্ত্র শুনিয়া
জাগিব আবার—।
হিমাচল হবে দূর কুমারিকা পার
কাননে, প্রান্তরে,

নগরে-নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে-পল্লীতে,
প্রাসাদে কুটিরে,
কোটি-কোটি মৃত প্রাণ, হোমাগ্নির প্রায়
উঠুক্ জ্বলিয়া,
মা তোর তাপসী-মূর্তি পূজিবে সন্তান
হিয়া রক্ত দিয়া।

প্রবাসী, ৬ষ্ঠ ভাগ, ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

পরলোকবাসিনী

মনে পড়ে পড়ে গো কেবল
সে তার করুণাস্নিগ্ধ, আঁখি ছল-ছল!
ধরণীর শ্যাম অঙ্গে স্নেহ-ডালা রাখি
বন উপবন হতে, মমতায় মাখি,
কুড়াইয়া ফল, ফুল, দিত উপহার,
ভাবিত কি যেতে হবে ধরণীর পার
এ মায়া বন্ধন ছিঁড়ি? নিরদয় কাল
বসন্তের বেলা শেষে ঘটাল জঞ্জাল!
কোন্ সুরবালা তার কানে-কানে হায়
দেছে বলে, 'মর্ত হতে কেড়ে নিয়ে আয়,
পরিমলগন্ধভরা বালিকাজীবন,
সঙ্গিনী করিব মম এই আকিঞ্চন।'
তাই কিরে না মিটিতে সাধ, ভালোবাসা
বালিকার অফুরন্ত হৃদয়ের আশা,
ধরণীর বক্ষ হতে রাক্ষসের মতো,
কেড়ে নিলি কাঁদাইয়া পরিজন যত,
প্রিয়তম বান্ধবেরে? পড়ে শুধু মনে
তার সেই বিদায়ের শেষ আলিঙ্গনে
অস্তমিত আঁখি তার বলে গেল হায়!
'তোমাদের ছাড়ি প্রাণ নাহি যেতে চায়';
স্নেহ সে তো মরে নাই ;—নিশীথ, সন্ধ্যায়
কত স্নিগ্ধ প্রভাতের অরুণ লেখায়,
যবে ধরা হাস্যময়ী চমকিয়া প্রাণ
সমীরে ভাসায়ে আনে ত্রিদিবের গান।

কভু ছায়াময়ী মূর্তি হেসে বলে যায়
'আবার আবার মোরা মিলিব সবায়!
তুমি এই সংসারের উপকূলে বসি
থাক যতদিন কাজ, আমি দিবানিশি
কভু মন্দাকিনীতীরে, মন্দারকাননে
তারকা খচিত ওই গগনের কোণে,
কভু চন্দ্রালোকে বসি বিজন অচলে,
মুক্ত বিহগের মতো শূন্য নভঃস্থলে,
উড়িব, ভ্রমিব সুখে, ব্যথা নাহি আর
ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বলোকে করিব বিহার!
মোছ প্রিয় নয়নের শোক অশ্রুজল
হেন আকুলতা দৈন্য বাড়ায় কেবল
আশ্বাসে জীবন লভি, মৃত্যুর সুষমা-
পূত লোকান্তর যেতে নরের কামনা।'
সে আশ্বাসে আছি বেঁচে, তবু রে কেবল
মনে পড়ে পড়ে সেই আঁখি ছল ছল!

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

প্রভাতে

কতরূপে হে অনন্ত, উঠিছ ফুটিয়া
সংসার হইতে যবে টেনে আনি হিয়া-
একি অপরূপ হেরি,—বিশ্ব-অন্তঃপুর
কি মাধুরী পরিপূর্ণ—মধুর, মধুর!
প্রথম প্রকাশ উষা স্তব্ধ চারিধার,—
নিদ্রাতুর ধরণীর জীবন-সঞ্চার.—
তখনো তারকা-বধূ পশ্চিম গগনে
প্রেমগীত প্রচারিছে নীরব কম্পনে।
সমীর সৌরভ মাখি দেবদূত হয়ে
সঞ্চারিছে নবশক্তি বিশ্বের হৃদয়ে!
কতদিকে কত দূত বারতা তোমার
হে অনন্ত, শতকণ্ঠে করিছে প্রচার।
আমি হেথা অনুদিন বিফল গৌরবে
প্রচার করিতে চাই আমারে এ ভবে,

কর চূর্ণ অহঙ্কার—আঁখির অঞ্জন,
একবার তোমাপানে ফিরাও নয়ন,

ব্রহ্মবাদী, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩১৯

প্রেমিক

প্রাণে শুভ্র কুসুমের গন্ধ মনোহর
পরিপূর্ণ শুদ্ধতায় আপনা বিভোর!
না আছে বন্ধন—প্রাণে মুক্তির আনন্দ,
বিশ্ব-তারে বাঁধা তার হৃদয়ের ছন্দ।
নিঃস্বার্থ, নিঃসঙ্গ তবু প্রেমিক প্রবর
সবারে বিলায় স্নেহ নাহি আত্মা পর!
নয়নে অন্তর-জ্যোতি উছলিয়া পড়ে
সুবিমল দিব্যহাসি ফুটিছে অধরে।
সংসারে করিয়া বাস সংসার অতীত,
কি যে প্রেম-রস-মগ্ন সে মহান্ চিত!
চায় না সে কাহারেও—সবে তারে চায়,
মানব নহে তো কভু—দেবতা ধারায়!

ব্রহ্মবাদী, পৌষ ১৩১৯

অর্ঘ্য-দান*

বিশ্বরাজ, তব বিজয়-নিশান দিক্ দিগন্তে উড়িছে,
দগ্ধ হৃদয় জুড়াতে আবার করুণার ধারা নামিছে।
পাঠালে তোমার মৃত-সঞ্জীবন,
কে আর পড়িয়া রবে অচেতন।
পুলক-কম্পনে, পরানে-পরানে, সে বারতা আজ ধ্বনিছে
বীণা-ঝঙ্কারে বাণী করুণার শ্রবণে-শ্রবণে পশিছে।
মধুময় তব বন্দন-গীত আকাশে বাতাস বহিছে
প্রাচীন ঋষির তপোবন হতে বহিয়া যেন গো এনেছে।

* বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে ১১ই মাঘের-আপরাহ্নিক উৎসবে পঠিত ও বিতরিত।

সত্য জ্ঞানে, প্রেমে ফুটাও জীবনে,
আনন্দ-রস আজি ঢাল প্রাণে-প্রাণে,
অনাদি কালের গৌরব যাহা কর সে অমৃত দান,
ওগো বরেণ্য, শরণ্য জনে চরণে দাও গো স্থান।
উৎসব-পুরে গৌরব সুরে অন্তরে বাজে গান
"থেকো না মৃত হীন পতিত, লহ শক্তি লহ প্রাণ।"
দাও তবে দাও হৃদয় ভরিয়া,
স্বার্থ-বিরোধ সকল ভুলিয়া,
সহস্র পরান হই আগুয়ান্ মুছিয়া বেদনা-শোক,
মঙ্গলময় বিশ্বে তোমার বিজয় ঘোষণা হোক।

ব্রহ্মবাদী, মাঘ ১৩১৯

নূতন বরণ

এসেছে যেমন কোকিল পাপিয়া—
শ্রবণে ঢালিতে সুধা,
দখিনা বাতাস, ফুলের সুবাস
হরিতে হৃদয়-ক্ষুধা ;
তেমনি কি তুই, এলিরে নূতন
জাগাইতে পুনঃ মানব-জীবন?
পড়ে গেছে যারা, উঠিবে এবার—
দরশে পরশে তোর?
নিরাশা-বেদনা, দুঃখ-যাতনা,
সকলি হইবে ভোর?
কালের মঙ্গল-ভেলা হয়ে তুমি
এসেছ করিতে পার?
হৃদয় পাতিয়া লইতে সবার—
শোক-তাপ দুঃখ ভার?
তুমি দেবতার দূত হয়ে এলে,
পূত[ম]ন্ত্রে আজি জাগাও সকলে
অতীত ভুলিয়া, হৃদয় খুলিয়া
গাইব তোমারি জয়,
রবে বারোমাস, আকাশ বাতাস
নূতন আলোকময়।

ব্রহ্মবাদী, ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২০

নিশীথে

নিশীথে স্বপন-ঘোরে সপ্ত ধরণীর—
অনাবৃত বক্ষে আজ হয়েছি বাহির ;
ধরণী আকাশ ঘিরি, একি অপরূপ হেরি,
মূর্তিমতী এ মাধরী নহে বর্ণিবার!
অসীমে মিশায়ে কায়া, কার এ মোহন মায়া,
ধরাতলে স্নেহ-ছায়া করিছে বিস্তার!
পতিত-পাবনী প্রেমে, স্বরগ-মরত চুমে ;
দু-হাতে পরশ কাঠি ঘুম পাড়াবার!
নাই দ্বন্দ্ব কোলাহল, নীচতার হলাহল,
বহে বায়ু সুনির্মল, স্তব্ধ চারিধার!
মায়ের অঞ্চল-তলে, অচঞ্চল যত ছেলে,
সব অপরাধ ভুলে নিদ্রায় কাতর!
বিরোধবিচ্ছেদ নাই, সব ভাই এক ঠাঁই,—
বিশ্ব-জননীর স্নেহে পবিত্র-অন্তর!

ব্রহ্মবাদী, ১৪শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩২০

আশার সুর

নীরব সুরে হৃদয়-পুরে যে গান বাজে
দিবস-যামী ;
সকল ত্যাগী তাহার লাগি উদাস হয়ে
জাগি আমি।
বেঁধে না আর প্রাণে আমার কোনো দারুণ
কঠোর বাণী ;
হারায়ে যাই সে সুরে তাই তুচ্ছ আমার
নিন্দা গ্লানি।
এম্‌নি করে মোহন সুরে সকল ব্যথা
তুচ্ছ গনি ;
মৃত্যু যদি দাঁড়ায় এসে তবু জীবন
ধন্য মানি।
এ লোক ছাড়ি যে লোক যাব, যাবে না কি
সঙ্গে তুমি?

(ওই) একটি সুরে বেঁধেছি প্রাণ, অন্য কিছু
নাহি জানি।

ব্রহ্মবাদী, ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২১

দুঃখাতীত

দুঃখ তুমি এসেছ আজ, ভিক্ষা নিতে
আমার কাছে ;
সকল ছেড়ে ফকির আমি, তোমায় দিতে
কি মোর আছে?
সবি যাহার গেছে ঘুচে, লজ্জা, জ্বালা
কিছুই নাই ;
তারে তুমি গলাবে আজ, কোন্ বেদনায়
ভাবি যে তাই!
সুখের লাগি ঘুরে যে জন, চায় না তোমায়
বাস্‌তে ভালো ;
তারি কাছে যাবে তুমি নিভাতে তার
সুখের আলো।
পথ ভুলে আজ এলে হেথা, বোসো আমার
আঙিনায় ;
তোমার পথের পথিক যারা, এ পথ দিয়ে
যদি বা যায়।

ব্রহ্মবাদী, শ্রাবণ ১৩২১

দুর্দিনে

সন্তান বেদনা-ভারে আজি অশরণ,
সন্তান-হরণ, তাই দিলে দরশন।
যখন ভিখারি প্রাণ হয়নি আমার,
তোমারে খুঁজেছি আমি কত শতবার।
আছিল অনেক গর্ব, আকাঙ্ক্ষা অপার,
তাই কি পাইনি, নাথ দরশ তোমার?

আজি মেঘে ভরপুর হৃদয়-আকাশ,
বিজলি হইয়া তাই হলে স্বপ্রকাশ,
মঙ্গল-পরশে তব হে চিরমঙ্গল,
নয়নের অশ্রু আজি হল তীর্থজল!
শীতান্তে বসন্ত-সম ঢালি প্রাণ-রস—
শুষ্ক জীর্ণ চিত্ত মোর করিলে সরস।
সকল গিয়েছে যাব—নাহি কোনো আশ,
তারি কাছে বুঝি তুমি হও সুপ্রকাশ।

ব্রহ্মবাদী, ১৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩২১

দেব-মন্দিরে

গোপন নিভৃত কক্ষ স্তব্ধ চারিধার,
হেথা আমি বক্ষে চাপা বেদনার ভার ;
ছোট বড় পাপগুলি হৃদয়ের মেঘ
তুলিছে ঘনায়ে ; কত ব্যাকুল আবেগ—
কাতর আহ্বান-ধ্বনি, হে মহামঙ্গল!
উঠিছে হৃদয় ভরি ; কোরো না নিষ্ফল
এ গোপন পূজা মোর ; পদতলে আমি--
আজি লুপ্ত দীপ্ত ধরা, হে হৃদয়-স্বামি ;
প্রাণের রাগিণী বাজে এক মহাসুরে—
তোমারে লভিতে হবে এ দেব-মন্দিরে ;
যেন গো নিখিল বিশ্ব নবীন সোহাগে
আর না বাঁধিতে পারে নব অনুরাগে ;
—চৌদিকে কুহক-ব্যূহ করিছে রচনা,
অন্তরে রাখিয়ো পূর্ণ, শূন্য করিয়ো না ;
বিশ্বময় কোলাহল কি ক্ষতি বা তাহে,
তোমার মঙ্গলস্পর্শ যদি পথে রহে।

ব্রহ্মবাদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

ভুলভাঙা

পথ তো ফুরায়ে এল, ভাবি মনে-মনে
এ যাত্রার নাহি বুঝি শেষ ;
নিতি ধরা মনোহরা—রূপে-রসে-গানে ;
নাহি কোনো ভাবনার লেশ!

কি এক উদাসী পাখি কোন্ দেশ হতে
এ আমার আকাশ ভরিয়া
কি যে গান গেয়ে গেল,—মর্মে মর্মে তার
নব সুর উঠিল বাজিয়া ;—

'এ যাত্রার আছে শেষ চিরন্তন হয়ে'
এ ধরণী রবে না আমার,
প্রিয়জন অনুক্ষণ হৃদয়ে নয়নে
করিবে না এ সুখ সঞ্চার ;—

কবে কোন্ মুহূর্তের একটি আহ্বানে
নীড়ভ্রষ্ট বিহগের মতো
উধাও হইবে প্রাণ মহাকাল মাঝে ;—
প্রাণে গীত ধ্বনিছে নিয়ত।

অন্তরে অনন্ত বাণী আচম্বিতে আজি
কোথা হতে দিয়ে গেছে সাড়া
কবে কোন্ নিমেষের প্রলয়-বাতাসে
তুইও যে রে হবি নীড়-হারা!

প্রভাত, নিশীথ, সন্ধ্যা যে বাঁশরি-সুরে
ছিল মোর মোহিত পরান,
আজি সে আর এক সুরে শুনায় আমারে
যাত্রাপথে বিদায়ের গান।

ব্রহ্মবাদী, ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২২

দুঃখ-মুক্ত

দুঃখের রসে যে জীবন-মূল
বেড়ে ওঠে প্রতিদিন,
ধরণীর ধুলো লাগে যদি গায়
হয় না সে বিমলিন।

দুঃখ, বেদনা দেবতারি দান
তাই সে যে মুক্তকাম,
পরম শান্তি-পরশ লাগিয়া—
হৃদয় স্বরগধাম!
জনমে, মরণে বিজয়ী চিত্ত
নিত্য সে ধন লভি
মানবের প্রীতি, বিরহের গীতি
তুচ্ছ করেছে সবি।
কেবা আপনার কেবা পর তার
সে বিচার নাহি আর,
এ লোকে ও লোকে যে আলোক জ্বলে
তারি পানে আঁখি তাঁর।
ধন্য জীবন, পুণ্য ভুবন
এ দুঃখীরে বুকে ধরি!
যে পথে সে যায় সৌরভ ছড়ায়
আকাশ বাতাস ভরি।

ব্রহ্মবাদী, ১৬শ বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২২

বর্ষ-আশা

কত জয় পরাজয় উত্থান, পতন,
কত হাসি কত গান আকুল ক্রন্দন—
বক্ষে ধরি, গেল মরি বর্ষ পুরাতন,
নূতন অরুণ-করে স্নাত এ ভুবন।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে আজ
নব বরষের আলো প্রতি হিয়া-মাঝ।
নব প্রেম নব তেজ নূতন কল্যাণ
ভাতিয়া উঠিছে পুনঃ হোমাগ্নি সমান।
জীবনের যত তাপ শোক পরাজয়—
হে নবীন, স্পর্শে তব হোক সুধাময়!
বিপথে না পড়ি পদ সুপথেই রবে—
পতনে না ডরি সবে চলিব গৌরবে।
ভুল চুক যত কিছু পুরাতন-সাথে
গেছে যাক— দিব্য মন্ত্র নবীন প্রভাতে

দিলে তুমি কর্ণে তার মধুর ঝঙ্কার—
'পরাজয় পতনে না রব পড়ি আর।'

ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩২৩

তোমারে চাই

উৎসবে, আনন্দে, শোকে, দৈন্যের মাঝারে
তোমারে পাইতে চাই আমার অন্তরে।
আকুল অশান্ত হিয়া কিসের কারণ?
তোমারে শুনাতে চাই মর্মের ক্রন্দন।

কত পাপ, অপরাধ কি মোহের ঘোর
তোমারে দেখাতে চাই সব শূন্য মোর।
জানি আমি জানি ওই মঙ্গল-পরশ—
বিরস পরান মোর করিবে সরস।

হেথাকার কোনো স্নেহ কোনো ভালোবাসা
পারিবে না মিটাইতে অন্তরের তৃষা,
যে করুণা নিয়ে এল সুন্দর ধরায়
মরণে উঠিব বেঁচে সে স্নেহ-ধারায়।
জানি আমি অন্তর্যমি, সে করুণা-ধারা
করিবে না কোনো দিন কভু পথহারা
তবু যে আকুল কণ্ঠে ডাকি বারবার
তোমারে করিতে চাই একান্ত আমার।

ব্রহ্মবাদী, আষাঢ় ১৩২৩

আকাঙ্ক্ষা

হে নিত্য, হে নিরঞ্জন, কল্যাণে তোমার
বাঁচায়ে রেখেছ মোরে ; ভাবি যতবার
ধরণীর হাসিকান্না, সন্তাপ দুর্দিন—
কিছুরে না ডরি আর! জানি অনুদিন
তোমার প্রসন্ন আঁখি, পূত আশীর্বাদ
ঘুচাইয়া দিবে মোর সকল বিষাদ—

সেদিন কি আসিবে না? এ ধরণী হতে
যেদিন বন্ধন ছিঁড়ি যাব যাত্রাপথে ;
বিশ্ব মোর ডুবে যাবে বিস্মৃতি-সলিলে,
অন্তরে জাগিবে তুমি, নয়নের জলে ;
বেদনার তীব্র তাপে দহিবে না হিয়া,
তোমার চিন্ময় রূপ উঠিবে ফুটিয়া
প্রকৃতির কক্ষে-কক্ষে, সর্ব চরাচরে,—
মোহাতীত সুনির্মল মানস-মন্দিরে।

ব্রহ্মবাদী, পৌষ ১৩২৩

নব-বর্ষ

কোন্ সে নক্ষত্রলোকে সাগর বেলায়
ছিলে তুমি হে নবীন? আজি ও ধরায়
বিলাইতে স্বরগের সুরভি আলোক
এলে কি হে দেবদূত! আনন্দ পুলক
বিতরিছ ঘরে-ঘরে—দৈন্য দুঃখ শোক
কিছুই না জাগে মনে। জীবন সার্থক
তব শুভ আগমনে।

ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩২৪

অন্তরে না এলে

বৃক্ষ মূল, নদীতীর, বিজন কানন,—
পবিত্র জাহ্নবী ধৌত তীর্থ অগণন,
কেমনে মুক্তির দ্বারে নিয়ে যেতে পারে,—
তুমি যদি নাহি এস ভক্তের অন্তরে?
গৌরব, সম্পদ, সুখ, প্রিয় পরিজন
সকলি ফুরায়ে যায়,—মিছে এ বন্ধন।
দুর্দিন ঘনায় যবে করি হায়-হায়।
তুমিই শীতল কর শান্তির ধারায়।
কতবার পথ ভুলে গেছি কতদূর ;
এনেছে ফিরায়ে তব আহ্বান মধুর।

ধূলি মাঝে আছাড়িয়া পড়েছি যখন,
যতনে তুলেছ মোরে, সেই পরশন,
জুড়াইয়া সর্ব ব্যথা,—সকল সন্তাপ,
সব অপরাধ হতে রেখেছে নিষ্পাপ।
সে স্মৃতি পরমা তৃপ্তি জীবনে আমার.
পথভ্রষ্ট হয়ে যেন না ভুলি আবার।

ব্রহ্মবাদী, ১৮শ বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৪

নব বর্ষ

বিশ্ব ভরিয়া যে প্রাণ-প্রবাহে
জীবজন্ম চেতনার,
হে নব প্রভাত, তোমারি আলোকে
পেয়েছি সন্ধান তার।
প্রতি ফুলবাসে, নিমেষে নিমেষে
অতীত স্মৃতির ধার।
নব পুরাতনে, মধুর মিলনে
নেহারি আপনাহারা।
একি অপরূপ কালের প্রবাহ
প্রকৃতি চেতনাময়!
কোথা মৃত্যু, কোথা বেদনা বিরহ
নাহি লয়, পরাজয়!
আঁধারে আলোক, মরণে জীবন,
রোদনে আনন্দ ঝরে,
পুরাতন সবি নূতন করিয়া
ফুটিছে জগৎ ভরে।
(তুমি) অজানা দেশের বারতা বহিয়া
বিলাইবে ধরণীতে
ঋতু, বর্ষসাথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
তুলিবে পতন হতে।
পরশ-কাঠির পরশ লভিয়া
নবীন আলোক তব
জনম ভরিয়া জীবনে জীবনে
ফুটাক্ চেতনা নব।

ব্রহ্মবাদী, ১৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫

মাতৃ মূর্তি

জগৎ-জননীরূপে কত শতবার
পেয়েছি তোমার দেখা, সেকি ভুলিবার?
দুর্দিন এসেছে কত বেদনা বহিয়া—
তোমার কল্যাণী মূর্তি উঠেছে ফুটিয়া
সর্ব অকল্যাণ হতে করিতে উদ্ধার
বিশ্বের জননী, ওগো জননী আমার।
যত ঊর্ধ্বে, যত দূরে যে অজ্ঞাত লোকে
আছ তুমি হে চিন্ময়ী, রোগে তাপে, শোকে
মূর্তিমান্ স্নেহস্বর্গ তব বক্ষ হতে
পারিবে না কোনো দিন ধুলায় ফেলিতে।
কোন্ ব্যবধানে তুমি রহিবে অন্তর?
দেশে, কালে, প্রাণে তুমি আছ নিরন্তর,
সকল হারায়ে যদি হই সর্বহারা
যাবে না হারায়ে তুমি ওগো ধ্রুবতারা।

ব্রহ্মবাদী, ১৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫

আশা

মরণ হতে জীবন পাব
চরণে পাব আশা—
ত্যাগের মন্ত্র ব্রত লয়ে
শিখ্‌ব ভালোবাসা।
তোমার আমার মিলন হবে
কথার কথা নয়,
পলে পলে ভাঙ্‌তে হবে
যা আছে সংশয়।
ঝড় তুফানে পড়্‌লে খেয়া।
জাগ্‌বে শুধু মনে—
অনিত্য সব, নিত্য আমার
এস সঙ্গোপনে।
সবি লুপ্ত, সবি সুপ্ত
সবি অন্ধকার

গোপন-সুরে হিয়ার তারে
আসিবে ঝঙ্কার।
শুদ্ধ হবে দরশ-পরশ
সরস হবে মন,
জীবন-ঘিরে আসুক ধীরে
সে শুভ লগন।

ব্রহ্মবাদী, ১৯ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৫

আসা-যাওয়া

ত্রিদিব আলোক-দীপ্ত গ্রহ তারকার
যে দেবতা বিরাজিত মহা মহিমায়।
তাঁহারি আদেশে জীব আসে আর যায়
যে বিধি ফিরাতে কেবা পেরেছে কোথায়।
কত মোহ, কত স্নেহ, কত ভালোবাসা
নরনারী প্রাণে কত আকুল পিয়াসা।
সবি ফেলে যেতে হবে, তাঁহারি বিধান,
কর্ম্মশেষে জীব কোথা লভিবে নির্বাণ?
জানি না. সে অজানার অজ্ঞাত কাহিনী,
মুক্ত বিশ্বে, নানা দৃশ্যে এক মহাবাণী—
ধ্বনিছে অনন্তকাল,—'যাওয়া আর আসা ;
একই পদপ্রান্তে আছে সবার ভরসা।'
ফুল ফুটে পড়ে ঝরে—জীবন সুন্দর
নয়ন হইতে সেও হতেছে অন্তর।
আসে যায় নাহি চায়, কারো মুখপানে
যে দেবতা বসে ওই মহা সিংহাসনে।
এক সে পরম মুক্তি যে চরণ-ছায়,
মরণ অমৃতময় হতেছে যেথায়।

ব্রহ্মবাদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

অমৃত-পরশ

কোন্ শুভ মুহূর্তের অমৃত পরশ
রেখেছ লুকায়ে তুমি—দিবস বরষ
আসে যায়, পাই নাই, পাব না কি কভু?
চারিদিকে মোহ—ঘোর ছাড়ি নাই তবু
সে আমার অন্তরের লুকানো ভরসা,
পাব তারে একদিন, এ অমৃত আশা
পলে পলে দিনে দিনে বাঁচায় জীবন ;
শুধু কি মানব তরে রয়েছে মরণ
আঁধারের রূপ ধরি? নয় কভু নয়—
একদিন একদিন পাইব নিশ্চয় ;
বরাভয়রূপে সেই মানস-দেবতা
ছোঁয়ায়ে পরশকাঠি সর্ব দুঃখ ব্যথা
দিবেন ভুলায়ে—সেই যাত্রাপথে মোর ;
রবে না রবে না কোনো বন্ধন-ডোর।
নতুন আনন্দ তৃপ্তি, নব শান্তি লয়ে
অমৃত লভিব প্রাণে মৃত্যু-পথ দিয়ে।

ব্রহ্মবাদী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৬

আমাতে তুমি

এক আমি ঘুরিফিরি সংসারের কাজে,
স্বার্থ, অর্থ, খুঁজি সারা দিবসের মাঝে।
মোহমুগ্ধ, আশালুব্ধ সেই মোর আমি
বন্ধনে জড়ানো কত, জান অন্তর্যামী।
নিশার আঁধার যবে আসে ঘনাইয়া
সুপ্তি মাঝে কে আমায় দেয় জাগাইয়া,
সচেতন হই কোন্ মঙ্গল-পরশে
ছিল সে লুকায়ে এই অন্তর-আবাসে।
স্বর্ণপুরী মাঝে সুপ্ত রাজপুত্র মতো,
জেগে ওঠে জীবনের অপরাধ যত।
ভুল ভাঙবার ভুল হয় না তখন,
তোমার পরশে লভে পরম চেতন।

যতটুকু দাও মোরে, সেটুকু আমার
তোমারি যে দান, সে তো নহে হারাবার।
যুগ-যুগান্তরে হোক লোক-লোকান্তরে
অণু-অণু মিশাইবে তোমাতে আমারে।
কোথায় খুঁজিব আর, কোন্ তীর্থস্থান—
আমারি অন্তরে তুমি আছ ভগবান্।

ব্রহ্মবাদী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২৬

বর্ষকামনা

কালস্রোতে ভাসিলাম, নতুন আমার
নব শান্তি দিয়ো গো আমায়
স্মৃতির সৌরভটুকু রেখে গেল চলে
পুরাতন বিদায়, বিদায়!
কোন্ বার্তা বহি তুমি এসেছ নবীন,
কোন্ সুরে বাঁধিয়াছ বীন্?
প্রাণধারা বহাইবে কোন্ সে সাগরে
সব ভুলি হব যাহে লীন।
ভাঙা গড়া জীবনের পূর্ণতার লাগি,
হয় হোক রুধিরাক্ত প্রাণ,
জয়, পরাজয়, দৈন্য, উত্থান, পতন
সকলি যে বিধাতার দান।
কত দুঃখ, লাজ, ব্যথা, গত জীবনের,
স্মরিব না সে কাহিনী আর,
নূতন প্রভাত-বায়ু, নিসর্গ মধুর
ঘিরে থাক্ মোর চারিধার।
সকল সন্তাপ মাঝে শান্তির নির্ঝর,
মূর্তিমান্ কল্যাণ ধরার,
নব জাগরণী সুরে মানবে মানবে
নব তেজে জাগাও আবার।

ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩২৭

বাদল-ধারা

এস গো বরষা-ধারা, সজল সুন্দর,
অমৃতে ভরিয়া দাও আমার অন্তর।
সব হয়ে যাক্ দূর, বাজুক্ একটি সুর,
এ ঘন বাদল-রাতে, ওগো মনোহর
আনন্দে ভরিয়া দাও সবার অন্তর।
একি শান্তি, একি আশা! এ কিরে আকুল ভাষা!
বাজিছে অনাদি সুরে মহা যাত্রা গান—
এ নহে বিরহ-গীতি, মিলন মহান্।
নাই রে প্রেমের দ্বন্দ্ব, কোথায় মোহের বন্ধ,
নাই রূপ রস গন্ধ আনন্দ অপার!
জাগিছে আমারি সত্তা, ডাকিছে পরম আত্মা
'ফেলে রেখে এস এই সাধের সংসার!'
বাদলের ধারাজলে, ভাসিয়াছি যে অকূলে
অন্তিমে এমনি সুরে ভাসিব আবার।
তাই রে বাদল-ধারা, সকল পিপাসা-হরা,
নিশীথে ভাঙিলে ঘুম ভাবি বারবার—
রবে না রবে না কিছু, ছুটে যাব পিছু-পিছু
অরূপের রূপে ডুবি হব একাকার।

ব্রহ্মবাদী, শ্রাবণ ১৩২৭

পরীক্ষা

মুহূর্তে সফল করি দিতে পার তুমি,
তবু যে-করুণা তব আসিছে না নামি?
এ বিধান মানবের কোন্ শুভ লাগি,
জান তুমি, জানি আমি ওগো অন্তর্যামী।

দুঃখে, ত্যাগে বেদনায় ফুটে যে পরান,
তাহারে ভাঙিতে কেহ পারিবে না আর,
হোক্ সে জীবন ব্যাপী অশ্রুজল ভার—
সার্থক করিবে তাহা তোমারি কল্যাণ।

প্রকৃতির শত কণ্ঠে বারতা তোমার
কভু শুনি, শুনি না যে মোহ অন্ধকার
ঘিরে ফেলে, চমকিয়া জেগে উঠি যবে
লজ্জায় ভরিয়া ওঠে অন্তর আমার।

উত্থান পতন আর ভাঙা গড়া দিয়া—
দিব্যালোকে একদিন উঠিব ফুটিয়া,
আছে এ আশ্বাস তাই আছি মোরা বাঁচি
হে অনন্ত, হে মহান্ শুধু কৃপা যাচি।

ব্রহ্মবাদী, ২১ বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৭

বসন্তে

উৎসব গান, মধুময় তান
আকাশ ধরণী-তলে
কুঞ্জে-কুঞ্জে, বিহগ কণ্ঠে
লতায় পাতায় ফুলে।
হৃদয়ে সবার দিয়েছে রে দোল
নাচিয়া উঠিছে প্রাণ,
(এ যে) নূতন দেশের মোহন ঝঙ্কার
নূতন দেশের গান।
এ বসন্ত কার, দিতেছে বাহার
চেতনার ঢেউ খুলি
কেবা আপনার, কেবা পর আর
ব্যবধান গেছে খুলি
আজ সে এসেছে দেবদূত হয়ে
জাগাতে সহস্র প্রাণ,
কে আসিবি আয়, ওই শোনা যায়
আনন্দময়ের গান।
কে বাঁচিবি আয়, বাতাসে বাতাসে
পরশে চেতনা জাগে ;
কে বাঁচিবি আয়, হৃদয়ে হৃদয়,
আজি নব অনুরাগে।

ব্রহ্মবাদী, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৭

প্রেমমন্ত্র

বাজুক সে প্রেমমন্ত্র কণ্ঠে নিখিলের
যাহার অমিয় ধারা জুড়াবে তাপিত ধরা
রহিবে না কোনো বাধা দেশ বিদেশের ;
খ্রিস্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, যে প্রেম বিলায়ে ধন্য
যে প্রেম সাধনে মুক্তি কোটি মানবের ;
সুখ স্বার্থ সব ভুলি, সম্পদ চরণে দলি
দুঃখ-ভার নিল হরি এই জগতের,
সে আশার প্রেমবাণী আবার আসুক নামি
কোথা মা পালনীশক্তি, মহান্ বিশ্বের!
তোমার করুণা দিয়া, রাখ সবে বাঁচাইয়া
দুঃখী তাপী নর-নারী এই জগতের।
জননী জগৎধাত্রী, ত্রিভুবন পালয়িত্রী,
এস বরাভয় দাত্রি! দুর্দিন আঁধারে,
এস ভক্তি এস কর্ম এস সনাতন ধর্ম
জগৎ কল্যাণ রূপে সবার অন্তরে।

ব্রহ্মবাদী, ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

নিবেদন

শুনাও শান্তির বাণী—হে শান্ত দেবতা,
যুগে যুগে মানবের সর্ব দুঃখ ব্যথা
হরণ করেছ তুমি, অনাথশরণ,
অভয়, আনন্দরূপে দাও দরশন।
যে গগন মুখরিত সামবেদগানে
ছিল একদিন, আজি সেই পূত স্থানে
নিখিল প্রেমের মন্ত্র করিয়া প্রচার
জাগাও, জাগাও দেব, অন্তর সবার।
অপরাধ, অমলিন, অকল্যাণ হতে
কর মুক্ত, ধর্মশুদ্ধ, পবিত্র ভারতে।
কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হোক্ তব নাম
শুনিব জগৎ ভরি তব জয় গান।

ব্রহ্মবাদী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২৮

প্রার্থনা

নয়নের ধারা হও ; অন্তরের ব্যথা
নীরব হৃদয়ে হও গোপন বারতা
নিশীথ সুপ্তির মাঝে ওগো মৌনব্রত ;
সুখ স্বপ্ন হয়ে তুমি রহিয়ো সতত।
যত দুঃখ, যত ব্যথা, যত আঁখিজল
সবারে জানি গো যেন তোমারি মঙ্গল!
হৃদয়ের আশা, তৃষা, ভালোবাসা হয়ে,
সকল বাসনা মোর রহিয়ো জড়ায়ে।
যে সুরে বাজাতে চাও এ হৃদয়-বীণা
ভুল বেজে যেন তারে বিফল করি না।
সকলি সঁপিতে যেন পারি গো তোমাতে
হে কল্যাণ, কর ত্রাণ, অকল্যাণ হতে।

ব্রহ্মবাদী, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৮

ইঙ্গিত

আকাশ বাতাস পাখির গানে, ফুলের সুরভিতে
লুকানো কার বাণী যেন শুনি আচম্বিতে।
আমোদ-প্রমোদ খেলা-ধুলা হাসি কলরোলে
ক্ষণিক যেন দেখি কাহার আঁখি ভরা জলে।
ভবের হাটে বেচা কেনাব এই যে গণ্ডগোল
দূর সুদূরে শুনি কে গায় 'হরি হরি বোল'
বন্ধনেরি আনন্দেতে বিশ্ব সুধাময়
উদাস সুরে বাজে বাঁশি 'কেউ কাহার নয়।'
যাত্রাপথে এ ইঙ্গিতে পড়ে শুধু মনে
সে সুখ নাহি জগতের এই যশ মান ধনে।
পরম কৃপা শরণ করি হলে আগুয়ান্
বন্ধনেরি মাঝে মোরা পাব পরিত্রাণ।

ব্রহ্মবাদী, পৌষ ১৩২৯

সুদূরের ডাক

ওই সুদূরের ডাক শোনা যায়
প্রাণ কেঁপে ওঠে তরাসে,
পথ ভুলে-ভুলে অপথেতে ঘুরি
দিন হল শেষ প্রবাসে।
সন্ধ্যা হয়ে এল আঁধার ঘনাল
নীড়হারা পাখি আমি যে!
অজানা অচেনা নূতন এ পথে
সাথী আমারে কে দিবে খুঁজে?
যত পুরাতন সবি গেছে ছেড়ে
এক পুরাতন তুমি
শত অপরাধ করেছি বলেও
ক্ষমা যে পাইব আমি।
আজ এ সময়ে এস তুমি এস
ব্যথাহারী ভগবান,
ডেকেছি যখন আসিবে তখন
অভয় করিবে দান।

ব্রহ্মবাদী, চৈত্র ১৩২৯

জাগরণ

আমি জানি আমি জানি,
মানব-হিয়ার পিপাসা-হরণ,—শুধু তুমি, শুধু তুমি,
তবু যাই দূরে, ভুলে আপনারে—ক্ষমিয়ো অন্তরযামী
আজি কোন্‌রূপে দেখিব তোমায়,
কোন্‌ নামে ডেকে পাব দয়াময়?
সকল কলুষ করিয়া হরণ, এস গো জীবন-স্বামী!
ধন যশ মান, গৌরব দান করে দু-দিনের লাগি,
তবু তাই খুঁজি, বুঝেও না বুঝি—বাসনার অনুরাগী
জাগে শুধু ব্যথা, চির আকুলতা—অশান্ত অধীর হিয়া,
যাঁরে পাব বলে, ভেসেছি অকূলে তারে তো হল না পাওয়া!
তীর হতে তীরে, নীড় হতে নীড়ে ঘুরিবি রে কত আর?
আয় ফিরে আয় হৃদয় আমার—অভয় চরণে তাঁর

অনাদিকালের বন্ধুরে আজ চিনেছি চিনেছি আমি,
মানব-হিয়ার পিপাসা-হরণ—শুধু তুমি, শুধু তুমি।

ব্রহ্মবাদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

প্রার্থনা

অসীম ক্ষমার মাঝে তোমার সদাই যারে ডাক
সবার সাথে বিরোধ তাহার ভুলিয়ে তুমি রাখ।
বেদনাতুর হিয়ার তারে, বাজে ব্যথা কতই সুরে
তোমার কৃপা মধুরতর রাখুক্ তাহা ঢাকি
সকলি তুমি দাও গো ছুঁয়ে রেখ না কিছু বাকি।

কথার মাঝে ব্যথারে যে জানাই সবার কাছে
করুণার কাহিনী সে তো মর্মে লেখা আছে,
তুচ্ছ যাহা তাহারে গনি, তোমার কথা শুনে না শুনি,
এমন করে ব্যর্থতারে বেড়াই হৃদে রাখি
তোমার কৃপা মধুরতর রাখুক তাহা ঢাকি।

শপথ করে যখনি নাথ! তোমার পথে চলি,
আল্‌গা হয়ে আসে আমার হিয়ার বাঁধনগুলি ;
এমনি করে ধীরে ধীরে, এসে আমার হৃদয়পুরে,
সকল ব্যথা জুড়ায়ে দাও, তোমায় শুধু ডাকি
আনন্দময়রূপে তোমার ভুবন রাখ ঢাকি।

ব্রহ্মবাদী, শ্রাবণ ১৩৩০

চিরন্তন

অন্তরে রয়েছ তুমি হে বিশ্বসুন্দর.
তোমারে খুঁজিব কোথা দূর-দূরান্তর?
তীর্থে-তীর্থে আছ তুমি জুড়িয়া হৃদয়
জীবনে কি পাই নাই শত পরিচয়?

অস্তগত রবিকর, ধরিত্রী আঁধার
নিঃশব্দ নির্জন গেহ, স্তব্ধ চারিধার—
সব ভুলে মনে পড়ে তাহার পরশ,
ফুটায়ে তুলিল মোরে এ দীর্ঘ বরষ।
বাল্য, কৈশোরের কত অসহায় দিন
আজো যার স্মৃতি মনে রয়েছে নবীন!
বেদনার সে কাহিনী যত পড়ে মনে—
কেহ নাই, কেহ নাই তুমি সেইখানে।
পথে পথে কত বাধা কত কাঁটা ছিল
কার সে পরম স্নেহ তারে উপাড়িল?
জীবনে এসেছে যত রজনী প্রভাত
ভুলেছি কি তুমি এসে ধর নাই হাত?
পতিত, লাঞ্ছিত, ভীত, নিরাশ্রয় জন
সেও জানে একমাত্র তুমিই শরণ—।
সর্ব পাপ, সর্ব তাপ করিতে হরণ
অন্তরে রয়েছ তার ওগো চিরন্তন।

ব্রহ্মবাদী, ২৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩০

ওপারের সুর

এই ভুবনের ওপার হতে আজ
যে গান এল ভেসে সুরে-সুরে,
উদাস করা সেই রাগিণী ধরে
হৃদয় আমার থাকবে দূরে-দূরে।
একটি গানের অপরূপ এই সুরে,
সকল যেন ভুলিয়ে দিয়ে গেল!
কোন্ জগতের স্মৃতি-সুধা বহি
কার মুরতি হৃদয় মাঝে এল!
বহু যেথা আসন পেতেছিল,
একটি সেথা পরম সাথী হয়ে,
কানায়-কানায় ভরিয়ে দিল প্রাণ,
কাজ কি আমার বহুর বোঝা বয়ে?
তবু মনে চমক লেগে ওঠে—
স্বপ্ন আমার যদিই ভেঙে যায়,

শুভক্ষণের অবসানের সাথে,
চোখের জলে কর্‌ব যে হায়-হায়!
ওরে স্মৃতি, ওরে সাথী, কল্প-লোকের প্রিয়,
গানের সুরে থাক্‌ রে হিয়ার মাঝে,
সোনার কাঠির পরশমতো ছুঁয়ে যাবি মোরে
যেথায় আমি থাকি যেমন কাজে।

ব্রহ্মবাদী, ২৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৩০

পাথেয়

বিশ্বের অন্তর হতে উঠিছে যে বাণী—
উদ্দেশে তোমার,
তাহারে খুঁজিতে গিয়া আকুল এ হিয়া
শ্রান্ত বারে বার।
হৃদয়ে বাজিছ তুমি কি বিচিত্র সুরে
কত মহিমায়,
তারি মাঝে পেয়েছি গো সন্ধান তোমার
নীরব ভাষায়।
উত্থান, পতন কত হাসি অশ্রু দিয়া
রচিতেছ মালা,
গোপন-পরশে তব লভিনু সান্ত্বনা
জুড়াইলে জ্বালা।
শুধু কি নিঠুর হয়ে দাও দেখা তুমি
রুদ্ররূপে হায়!
কত তৃপ্তি, কত শান্তি ভরসার বাণী
শুনালে আমায়,
আমার অন্তর-মাঝে হেরি নিশিদিন
যে লীলা তোমার
সেই যে গো পুণ্যতীর্থ, মহাযাত্রা পথে
পাথেয় আমার।

ব্রহ্মবাদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

সে-দিন

আমারি এই অন্তর-আসনে, পরম রতন হয়ে
আস্‌বে যে দিন তুমি,
এই শব্দ, পরশ, রূপ গন্ধ রসে আকুল হব না তো
জানি তাহা জানি।
সে দিনের আর ক-দিন বাকি, কোন্ জগতের তীরে
আগমনের পুলক শুধু রইবে আমায় ঘিরে?
ব্যাকুল হয়ে ভাবি মনে-মনে তুচ্ছ আমার
বিষয় বিভব যত,
এ জগতের দেনা পাওনা মিটবে নাকি তাতে
এ জনমের মতো!
মুক্ত আমি হব সবার ঋণে, শুদ্ধ হব
তোমায় দেখার মতো ;
সেই দিনটি পরম সু-দিন হয়ে আসবে যে দিন
বাকি তাহার কত?
জীবন-দীপটি নিভে যাবার আগে, ভাবছি মনে মনে
কোন্ সে আলোক-পুলক-মাঝে দেখা হবে মোর
কবে তোমার সনে।

ব্রহ্মবাদী, আষাঢ় ১৩৩২

বিদায়

বিশ্ব বীণার তারে তারে,
সে সুর বাজে ভুবন ঘিরে,—
সেই সুরে আজ ভেসে যাবে মন!
ধন মান তোর থাকুক পড়ে
সঙ্গে সে সব যাবে নারে—
যাবে না এই প্রিয় পরিজন!
কত দিনের মোহন ধরা
সে যে শুধু স্বপন ভরা
নিমেষে তার হতে পারে শেষ!
কোন্ তরী ওই যায় যে ভেসে
সেই আলোকে ওপার হাসে

দেখবি রে তুই সেই সোনারি দেশ।
হৃদয় টুটে হোক না শতখান,
উচ্চ তারে বেঁধে নে তার প্রাণ—
'বিজয়ী' তোর হতেই হবে আজ।
মিটিয়ে নে তোর সকল ডাকা,
গুটিয়ে দে তোর প্রাণের পাখা,
শেষ করে দে এই ভুবনের কাজ।

ব্রহ্মবাদী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩২

নববর্ষের প্রতি

এস এস নববর্ষ, নূতন শকতি,
চারিদিকে হেরি আজ কল্যাণ-মুরতি।
যত দুঃখ, লজ্জা, ভয়, ব্যথা অপমান।
তব শুভ আগমনে হোক্ অবসান।
বিশ্বের বিধাতা যিনি মর্মের দেবতা
তব করে দিয়াছেন শান্তির বারতা
অশান্ত মানব তরে, শুনাও সবারে
অভয় সে দেব-বাণী, বাঁচাও দেশেরে।
ধর্মহীন কর্মে দেশ হবে না উদ্ধার—
পূত রক্ত সর্বদেহে কর গো সঞ্চার!
বরষের অন্ন, জল, আকাশ, বাতাস,
প্রাণশক্তি দিয়ে তারে কর সুপ্রকাশ।
ঘুচুক্ দ্রারিদ্র্য—আর দুর্গতি অশেষ,
ধর্মে কর্মে গরীয়ান্ হোক এই দেশ।

ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩৩৩

ভক্তের আশা

তোমারি ভাবনা-স্বর্গ অন্তরে আমার রবে নিরন্তর,
সংসারের ধন-মান যশ স্নেহমোহে হব না কাতর!
যে তুমি এনেছ মোরে সুন্দর ধরায় পরম সুন্দর,
যাত্রাপথে সেই তুমি একান্ত আমার কাছে স্থিরভর।

তবু আজ হয় মনে সে আমার আশা হবে কি বিফল?
যেতে হবে—নিতান্তই যেতে হবে বলে হিয়া কি চঞ্চল
নিত্য আবাহন তব আসিতেছে ভবে, তাহে কি বা ত্রাস?
তুমি যে ভকত-বন্ধু, জীবনের সাথী পেয়েছি আশ্বাস।
তবে কেন, কেন মোর আঁখি কোণে জল পরান বিহ্বল?
দুর্বলের ভগবান, অনাথ-শরণ, দাও প্রাণে বল।
যে প্রকৃতি একদিন দেছে সুধা ঢালি হৃদয়ে আমার,
প্রিয়তম প্রিয়জন যারা দিল প্রাণে আনন্দ অপার,
ইহ পরলোক হতে তাঁদের আশিস দিবে আলো জ্বালি—
বিজয়ী বীরের মতো তোমারি সন্ধানে যাব একা চলি।
মরণে রবে না ভয়, হে অমৃতময়, তোমারি সন্তান
যে মন্ত্র পেয়েছে, ব্যর্থ হবে না তা কভু, জয় ভগবান্।

ব্রহ্মবাদী, কার্তিক ১৩৩৩

বর্ষ-কল্যাণ

বরষে-বরষে তুমি আরো সত্য হয়ে
ঘিরে রাখ অন্তর আমার,
দরিদ্রের ভগবান, সর্ব কর্মে, প্রেমে
সত্য হয়ে জাগো অনিবার।
যত প্রিয়, প্রিয় জন, হেরিনু সবারে
দারিদ্রের নাহিকো সম্মান
ঐশ্বর্যে, সম্পদে, সুখে ভোগলালসায়—
প্রাণময় তৃষ্ণা অবিরাম।
প্রাণ আছে, বিত্ত নাই, আছে উচ্চ আশা,
ভোগ-সুখে নাহি অভিলাষ,
হে দয়াল, তারে তুমি রেখেছ কেবল
তব রূপ করিতে প্রকাশ।
যে বরষ ডুবে গেল নূতনের কানে
রেখে গেল ধ্বনি—
'ধন, জন, বিত্ত, খ্যাতি, কিছু—কিছু নয়, শুধু
প্রেমে তাঁর যতটুকু তুমি।

দীপ্ত হয়ে, তৃপ্ত হয়ে, মত্ত হয়ে ধাও
ছুঁয়ে যাও সেই মহাপ্রাণ,
জগতের লাগি যারা আত্ম-বলি দিয়ে—
সাধিতেছে বরষ-কল্যাণ।

ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩৩৪

দেবতার প্রতি

কত পথ ঘুরে ঘুরে এসেছি কোথায়,
আজ বিশ্রামের তরে কেঁদে ওঠে প্রাণ
তোমারে ধরিতে চাই নিবিড় ব্যথায় ;
সান্ত্বনার পথ খুঁজি, হবে কি নির্বাণ
অন্তরের জ্বালা মোর? হে শান্ত সুন্দর।
চিত্ত পূর্ণ করি রহ, চির-মনোহর!
কে চায় জীবন হতে, জীবনের প্রিয়,—
সুদিন দুর্দিনে সুখ-দুঃখের সহায়—
তোমারে রাখিতে দূরে ; ডেকে কাছে নিয়ো
জুড়াইতে সর্বতাপ স্নেহের ছায়ায়।
কত পাপ, অপরাধ, কত অবহেলা—
অভাগা বলিয়া তবু ছাড় নাই মোরে,
আজ যদি এলে কাছে, একান্তে নিরালা,
তোমারি করিয়া মোরে লহ চিরতরে।

ব্রহ্মবাদী, চৈত্র ১৩৩৪

শেষ দিনে

ধন যশ মানে, বিপুল সম্মানে
মিলে না তো সন্ধান—
বুঝেছি সে কথা, হে মোর বিধাতা,
দরিদ্রের ভগবান!
জীবন-সায়াহ্নে ভাবি মনে-মনে,
যত কিছু আমি পেয়েছি জীবনে,

তোমারি তা দেওয়া রাখিনি স্মরণে-
তবু করিয়াছ দান!
শোকে দুঃখে কত দিয়েছ সান্ত্বনা
ভুলে ভুলে গেছি সে তব করুণা,
ধরণীর ধুলো—ভাবিয়াছি সোনা,
গাহি নাই তব নাম!
সংসার যাক্ সরে বহুদূর,
অন্তর আজ কর ভরপুর,
অনিত্যের মাঝে হে নিত্য মধুর!
তোমাতে ডুবাও প্রাণ।

ব্রহ্মবাদী, আষাঢ় ১৩৩৫

আচার্য জগদীশচন্দ্র

(জন্মোৎসব উপলক্ষে)

ভারত-গৌরব-ভাতি, বিমল-প্রতিভা,
স্বদেশে বিদেশে আজ তব যশ বিভা
প্রসারিত, বিভাসিত, যত গুনী-জ্ঞানী
শুনি মুগ্ধ তব পূর্ণ প্রজ্ঞানের বাণী।
কি শুনালে, কি বুঝালে, কি তুমি শিখালে,-
অন্তর্যামি। উদ্ভিদের অন্তর দেখালে।
শুনিলে তাহায় গূঢ় প্রাণময় গাথা—
ঘুচাইয়া জড়ত্বের সুকঠিন বাধা
প্রকাশিলে বিধাতার সৃষ্টি সুমহান ;
বিশ্বের বরেণ্য ঋষি দিয়েছ সন্ধান
কি সত্য জগৎ-জনে,—নমি শতবার
একনিষ্ঠ ত্যাগী পুত্র ভারত-মাতার।
প্রকৃতি-চরণ-তলে সঁপি আপনারে
আনিলে কি মহাতত্ত্ব মানবের দ্বারে।
কবি তুমি ঋষি তুমি, তুমি মহাজ্ঞান
দুঃখিনী মাতার বিশ্ব-বিজয়ী সন্তান।
এক চন্দ্রে জগতের অন্ধকার নাশ,
তোমার আলোকে দীপ্ত ভারত-আকাশ।

দীর্ঘ আয়ু, দীপ্ত যশ, অক্ষয় সম্মান,
বিধাতার আশীর্বাদে লভ দিব্য প্রাণ,
এ শুভ জনম-দিন হোক্ বার-বার,—
কৃতার্থ জনম ভূমি এ বঙ্গ তোমার।

বঙ্গলক্ষ্মী, পৌষ ১৩৩৫

কবির সান্ত্বনা

কবিতার মালা গাঁথিয়া-গাঁথিয়া দিয়েছিনু প্রিয়জনে,
ব্যর্থ মালিকা ফিরায়ে এনেছি আজি তব শ্রীচরণে।
আকাশ বাতাসে নানারূপে রসে পরশ জাগাও প্রাণে,
ভারে ফুটাইব সবারে শুনাব বড় সাধ ছিল মনে।
তোমার বাণীতে যে রাগিণী বাজে আমার হৃদয়-বীণ
আজ যদি তাও না পার বাঁধিতে পারিবে তো একদিন।
ভাবরসে ভরি মোহন বাঁশরি তুমিই দিয়েছ করে,
তোমার সে দান, হবে না তা ম্লান বাজিবে মহান সুরে।
আছে এ প্রত্যয় এ মোর চিত্তে ঢেলেছ যে সুধারস,
তুমিই তাহার বিচারক হয়ে দাও মান, অপযশ।
মানবের হাতে পারি না তা দিতে তারা কি বুঝিবে তার,
তোমায় আমায় কি যে কথা হয় ভাষা নাই বুঝাবার।
হয়তো এপারে সে গান আমার সাঙ্গ হবে না কভু,
বুঝিবে না কেহ, কেহ বা হাসিবে কণ্ঠে ধ্বনিবে তবু।
যে পথ ধরিয়া যেথা যাই আমি শুনিব তোমারি বাঁশি,
অপথ হলেও পাব ফিরে পথ চরণে লুটাব আসি।

ব্রহ্মবাদী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩৫

নববর্ষ

হে নব বরষ, তোমার পরশ
চিত্তে হরষ আনিবে ;
আঁধার রাশি— ফুটাইবে হাসি,
জীবনের বাঁশি বাজিবে।
এস অজ্ঞাত, কর জাগ্রত—
শত শত চিত পুলকে,

লাজ, অপমান,   ব্যথা, অভিমান,
ঘুচে যাক্ তব আলোকে।
পথ হারা জনে,   শুনাও শ্রবণে
শান্তি-মধুর সুর,
আঘাতে-আঘাতে,   ধুলায় লুটাতে
সে কেন থাকিবে দূর?
নূতন বন্ধু,   নব যাত্রা-পথে,
এস, এস, এস সুধা-পাত্র হাতে,
আত্মার আশা,   অমৃত-পিয়াসা—
মিটাও তোমারি প্রভাতে।

ব্রহ্মবাদী, ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৬

করুণার জয়

যে জন এসেছে দ্বারে আশা লয়ে প্রাণে,
অকরুণ হয়ে তারে ফিরাও কেমনে?
একটি মধুর বাণী, দৃষ্টি করুণার,
প্রাণে প্রাণে করে কত শকতি সঞ্চার ;
এ পবিত্র স্বর্গ হতে বঞ্চিত যে জন,
সেও 'দয়াময়' নাম করে উচ্চারণ!
যাঁর করুণার গানে বিশ্ব ভরপুর,
তারে কি পূজিতে পারে নির্ম্মম নিষ্ঠুর?
প্রেম-পূর্ণ স্বার্থশূন্য অকলঙ্ক প্রাণ—
হে দয়াল,—সেই চিত্তে তব অধিষ্ঠান।
জগৎ জুড়িয়া বহে করুণার ধারা,
দুর্দিনে হব না কভু ভীত, পথহারা ;
সংসার ছাড়িতে পারে, তুমি ছাড়িবে না-
এ আমার কত বড় আশ্বাস, সান্ত্বনা।
এসেছে তামস রাত্রি, আসিবে আলোক
গাব করুণার জয়, ভুলি দুঃখ শোক।

ব্রহ্মবাদী, কার্ত্তিক ১৩৩৬

মাঘোৎসব

মধু মাঘ মাসে পুলকে হরষে সরস বঙ্গভূমি,
দেশে দেশে তার ধ্বনিছে আবার পূত ওঁকার ধ্বনি।
ভক্তির তান, মুক্তির গান, প্রাণে প্রাণে আকুলতা—
ঘুচাইয়া দিল সারা বরষের দুঃখ সন্তাপ ব্যথা।

যত ভুলে থাকা, যত দূরে রাখা, যত যত অপরাধ,
করিয়া হরণ, পরমশরণ, জীবনে এনেছ স্বাদ।
করি অনুভব হে মহান্ তব—নব বরষের বাণী—
'ভুলিয়া তুচ্ছ, ভাবো রে উচ্চ জীবন ধন্য মানি।'

ব্রহ্মবাদী, ফাল্গুন ১৩৩৬

নবীনের প্রতি

আশা, ভাষা, ভালোবাসা, সবি নিয়ে এলে তুমি
হে আমার সুন্দর মোহন,
তোমার ভবিষ্য-মাঝে, কত দুঃখ ব্যথা আছে,
তবু তুমি, প্রিয়—প্রিয়তম।
পুরানো চলিয়া যায়, ছাড়ি তারে বেদনায়—
আছে আশা, হে নবীন তুমি-
অজানা মোহন মন্ত্রে জাগাবে হৃদয়-যন্ত্রে
অপরূপ সুরের রাগিণী।
আঁধারে ফুটিবে আলো আবার বাসিব ভালো,
জগতেরে করিব আপন ;
বিলাইব যত পারি, শূন্যেরে লইব ভরি
সুধাস্মৃতি করিয়া বহন।
শত আকাঙ্ক্ষার মাঝে নূতন রাগিণী বাজে
প্রীতিময়ী প্রকৃতি মধুরা
ছায়া-সম সাথে সাথে, নিয়ে যাও নব পথে
হোয়ো তুমি সর্ব্বদুঃখহরা।

ব্রহ্মবাদী. বৈশাখ ১৩৩৭

বর্ষ শেষ

হে অতিথি, এসেছিলে দু-দিনের তরে
নিয়ে গেলে সুখ, দুঃখ বেদনার ভার,
তব সুধাস্মৃতি বুকে রহিবে গোপনে,
জানি তুমি এই পথে আসিবে না আর।
আজি বিদায়ের দিনে স্মরি সেই কথা
নয়নে আসিছে জল, স্মৃতি জাগে প্রাণে,
একটি একটি করি গিয়াছে ববষ—
ফিরে তো পাব না তাহা আর এ জীবনে।
কোন্ দূর সুদূরের কত শুভক্ষণ,
দুর্দিনের ব্যথাময় বিমলিন ছবি,
কত পাওয়া না পাওয়ার আকুল ক্রন্দন,
ছায়াচিত্র-সম আজ জাগিতেছে সবি।
জানা অজানার মাঝে কত ব্যবধান,
বিশ্বের সকল সুরে এক ভগবান্—
তিলে-তিলে কালে-কালে জানিলাম তাঁরে,
বিদায় এনেছে আজ মিলন দুয়ারে।

ব্রহ্মবাদী, চৈত্র ১৩৩৭

নববর্ষ

পরম উজ্জ্বল, ওগো পরমসুন্দর!
তোমারি লাবণ্যে পূর্ণ বর্ষ মনোহর।
কত গান, কত ছন্দ, কত হর্ষ আনন্দ সংগীতে
পরিপূর্ণ দশ দিশি, রূপ-গঙ্গা হতে
এল কি করিয়া স্নান? সুখ-দুঃখ নয়নের জল
ধরণীর শত ব্যথা—বাড়াবে কেবল
তোমার মর্মের ভার, উত্থান পতনে
তবুও অটল তুমি, মানবের প্রাণে—
পুরাতন পথ ধরি নূতনের সুর
উঠিবে বাজিয়া চিত্ত করিয়া মধুর।
স্মৃতি সে তো মরে নাই, বেঁচেছে আবার
নবতর আশা লয়ে তোমারি মাঝার।

তাই আজ প্রভাতের জাগরণী গানে—
কি অমৃত ঢেলে দিল পরানে-পরানে!
আজি আমি বুঝিয়াছি হে আমার সুন্দর মহান!
তোমারে বাসিতে ভালো দিয়েছিলে এই কবিপ্রাণ।

ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩৩৮

মিনতি

আমায় রেখ না দূর,   তোমার আহ্বান সুর
বাজে যেন কানে,
জনমের যত দুঃখ   যত ব্যথা যত সুখ
রাখিব চরণে।
সুদূরের পথ লাগি,   আজিও রয়েছি জাগি—
করুণ নয়নে,
এখনো এল না দৃষ্টি,   তব নাম কত মিষ্টি—
জেনেও জানিনে।
আসুক যতই বাধা   প্রিয় নাম হবে সাধা—
এই আকিঞ্চন,
কত ভাঙি কত গড়ি,   ধুলায় লুটায়ে পড়ি,
অসহায় মন।
আজি তুমি দাও বল,   মুছাও আঁখির জল,
ভরসা কেবল—
তুমি ফিরাবে না কভু,   তোমার করুণা পভু
জীবন সম্বল।

ব্রহ্মবাদী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩৮

মৃত্যুর পারে

মরে গেছে ঝরে গেছে পুড়ে হল ছাই
তার কি কোনই চিহ্ন এ জগতে নাই?
আকাশে চাঁদিমা ভাসে তারি হাসি লয়ে,
কাননে কুসুম ফোটে সুরভি মাখিযে।

বিহগের কলকণ্ঠে যে আনন্দ তান—
ওরি সাথে মিশে গেছে তারি মিষ্ট গান।
প্রকৃতি মাতার কোলে যে অতুল ছায়া,
মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে দিক্ আলোকিয়া।
আমি দেখি সে যেন গো মরণ-বিহীন—
ধরণীর অঙ্গে-অঙ্গে হয়েছে বিলীন।
অরূপের মাঝে রূপ ব্যাপ্ত চরাচর!
বিদ্রোহী হইয়া হল অক্ষয় সুন্দর।

ব্রহ্মবাদী, ফাল্গুন ১৩৩৮

নূতন

কাল-সাগরের ঊর্মিমালায় পুরাতন ওই গেল রে!
নিখিলের বাণী করিয়া বহন আজিকে নূতন এল রে!
নব কুসুমের নূতন মালিকা, বহি নিয়ে এল গোপন-লিপিকা
আকাশ বাতাস ভূধর সাগর তারি জয়গান গাহে রে,
পরান আমার সুরে-সুরে তার মধুরে মধুর বাজেরে!

অশ্রু-সজল পুরাতন মাঝে যাহা আছে পড়ে থাক্.
এসেছে দীপ্ত উজল নবীন শুনে চলি তারি ডাক।
অনাগত বাণী, কিছুই না জানি, তবু তারে মানি চল্ রে—
দুঃখের গান হোক্ অবসান, নব আনন্দে জাগ রে।

হে নব বরষ, তোমারি পরশে নব সুধারস লভিয়া
যাত্রাপথের পথটুকু মোর. নির্ভয়ে যাই চলিয়া।
যাহা চাহি নাই, তাও যদি পাই, তাহে ক্ষতি নাই ভাবি রে,
অশুভের মাঝে চিরশুভময় বিরাজিত হিয়া মাঝারে।

ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩৪১

সাধক

মানব অন্তর লোকে বাণী হয়ে তুমি
ফুটে উঠ সবে প্রভু, এই মর্তভূমি
আনন্দসুধায় স্নাত পত্র, পুষ্প, লতা
সকলি শুনায়ে যায় তোমার বারতা।
বিশ্ব একি অপরূপ। হে মনোহরণ,
তোমার কল্যাণরূপ যেন অনুক্ষণ
তাহারে ঘিরিয়া রাখে, পথের আঁধার।
একদিন করেছিলে যারে মন্ত্রপূত ;
তোমারি প্রসাদে আজ সে দেবদূত।
লভি শক্তি, মুক্তপ্রাণ, আলোকে পুলকে
বিলাইছে আপনারে সুন্দর ভূলোকে—
তারি মন্ত্রে জেগে উঠে সহস্র পরান,
হের যে বিশ্বের মাঝে হয়েছে মহান।

ব্রহ্মবাদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

নব বর্ষ

সেও এসেছিল এক শুভ সুপ্রভাতে
অশ্রুজলে চলে গেল বিদায়ের পথে—
অস্ত আর উদয়ের নীরবতা মাঝে
হে নূতন, এলে একি অপরূপ সাজে?
ধরিত্রীর অঙ্গে অঙ্গে কি লাবণ্য-রেখা,
মানবের মর্মে-মর্মে আনন্দের লেখা,
শুভ্র, শান্ত, নিরমল জীবনতটিনী—
কি যে তার পরিণতি, কিছুই না জানি,
তবু তার তীরে তীরে কত শ্যামলতা—
পরশে জুড়ায়ে যায় সর্ব তাপ, ব্যথা।
কোন্ সে খেয়ালী, তাঁর একি নব খেলা,
শূন্য করি ভরি দেয় এ জীবন-বেলা!
একটি দিনের আলো, সাঁঝের আঁধার—
ফুটাইয়া তোলে প্রাণে পরম আত্মার—
অবিনাশী রূপরাশি, সর্ব মোহ হতে
মুক্ত আমি সেইক্ষণে, হৃদয় বীণাতে

ছিন্ন তারে বেজে ওঠে নবীন ঝঙ্কার,
মনে হয় এ জীবন ব্যর্থ নহে আর।

ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩৪৩

অরূপের রূপ

রূপ সিন্ধু মাঝে হেরি অরূপ তোমায়,
হৃদয় ভরিয়া গেল সুধাব ধারায়!
কোন্ মৃত্তিকায় খুঁজি, কোন্ তীর্থ-নীরে,
স্ব-প্রকাশ, বিরাজিত বিশ্বের মন্দিরে—
উদার আকাশতল, সিন্ধুর সুনীল জল,
ওই গিরি নির্ঝরিণী অশ্রান্ত উচ্ছল।
প্রান্তব দিগন্ত নীল শ্যামা মধুরিমা,
প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে কার এ সুষমা?
হায় রে সম্বলহীন, কুণ্ঠা ছিল মনে—
তাঁর দেখা পাবি তুই ক'বে কোন্ খানে?
শত হস্ত বাড়ায়ে যে ধরিবারে চায়,
'পাই নাই' বলে তারে দিবি কি বিদায়?
অন্তরে বাহিরে হেব অপূর্ব আলোকে
তাঁরি জ্যোতির্ময় রূপ, দ্যুলোকে ভূলোকে!

ব্রহ্মবাদী, শ্রাবণ ১৩৪৩

সাধন-পথে

এক বিন্দু অমৃতের লাগি
কি আকুল, পিপাসিত হিয়া,
এক বিন্দু শান্তির লাগিয়া
কর্ম-ক্লান্ত দুটি বাহু দিয়া—
কাজ শুধু করে যায়—
অন্তরের দুরন্ত সাধনা,
তুমি তার দীর্ঘ পথে
হবে সাথী, একান্ত ভাবনা।

সে জানে এ আরাধনা
কবে তার হইবে সফল ;
তব বাণী যেই দিন,
তারি ভাষা হয়ে, ঘুচাবে সকল
অন্তরের অহঙ্কার,
স্তুতি, নিন্দা, ভয়
সেদিন লভিবে শান্তি,
সংগ্রামে বিজয়।
তোমার স্বরূপে তার রূপ হবে লীন!
সেই তার সাধনার পরম সুদিন।

ব্রহ্মবাদী, ভাদ্র ১৩৪৩

বিশ্বরূপ

যে গান ফুটিয়া ওঠে বিহগ কূজনে,
যে সুধা ছড়ায় চাঁদ নিখিল ভুবনে,
যে আলো চুমিছে ধরা সহস্র কিরণে,
ফুলবন বিকশিত সৌরভে কুসুমে
কার তরে, কার জয় গানে?
ভাবি মনে দিনমান, নিশীথ শয়নে,
এত প্রেম এত হাসি কার আগমনে,
কোন্ উৎস প্রতিদিন জীবনে জীবনে
সুধারস ঢালি অনিবার
নবতর জীবন সঞ্চার—
করিতেছে, রূপ, রস গন্ধ স্পর্শ দানে,
কে তুমি ভোরের আলো, অসীম গগনে
ধ্রুবতারা, প্রকৃতিরে বিচিত্র বিধানে
ওগো শিল্পী, রচিতেছ করি মনোহর,
পরম সুন্দর—
অন্তরালে আছ, তবু প্রতিবিম্ব তার
বক্ষে লয়ে দুলিতেছে নিখিল সংসার—
যাঁর আঁখি পিপাসিত সেই জন হেরে
মহা রহস্যের মাঝে—চিন্ময় তোমারে।

ব্রহ্মবাদী, কার্তিক ১৩৪৩

অপ্রকাশিত কবিতা

ছাত্ররা যে ধরনের কম-দামের ছোটো চৌকো-মাপের খাতা ব্যবহার করে থাকেন, কুসুমকুমারী সেই- ধরনের খাতাতেই লিখতেন তাঁর দিনলিপি এবং সেই সঙ্গে তাঁর কবিতার খসড়া। সম্পূর্ণ কবিতা অনেক সময়েই সেগুলি হয়ে ওঠেনি—দুই, চার বা ছয় পংক্তি লেখা হয়েছে হয়তো বা। একসময়ে কুসুমকুমারীর লেখা সেই খাতা কয়েক দিনের জন্য দেখতে পেয়েছিলাম নলিনী দাশের সৌজন্যে। তখন সেই খাতা থেকে অনুলিপি করে রেখেছিলাম কয়েকটি টুক্‌রো-কবিতা। এই কবিতাগুলি প্রায়শই অসম্পূর্ণ এবং অপ্রকাশিত। কয়েকটি কবিতার টুক্‌রো এখানে প্রদত্ত হল। কুসুমকুমারীর সেই খাতাটি এখন আবার পাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। যদি পাওয়া যায়, হয়তো আরও কয়েকটি কবিতার টুক্‌রো পাওয়া যাবে।

নিরাকার আকারে,
অরূপ-রূপে,
একি লীলা ভিতরে-বাহিরে।
নীরব যাচনা অন্তরে-অন্তরে—
সকল ডুবিয়া থাক শান্তির সলিলে।

২০.১০.১৯৪২

কালাতীত কালে,
দেশাতীত দেশে,
সীমাহীন, অসীমে,
ভুবনে-ভুবনে—
অমৃত-ভবনে—
মরণহীন

অমলের দেশে।
যাইব আনন্দে হেসে।

২১.১০.১৯৪২

এই বাড়ি এই ঘর এই লতাপাতা
ইহারে ছাড়িয়া আমি, বল যাই কোথা—
কৈশোরের যৌবনের বার্ধক্যের ভূমি
হে নগরী, তব সনে বাঁধা আছি আমি
হেথায় খুলেছে মোর অন্তরের দ্বার
সকল ঐশ্বর্য নিয়ে এলে বারবার—

২৬.৪.৪৩

জগৎ জননী আজ আসিছেন ঘরে,
কোথা বাড়ি কোথা ঘর পথে ও প্রান্তরে
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন জন
আজি পাতিযাছে তার ধুলার আসন—

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৩

নোয়াখালি হল তাই বিশ্বতীর্থ ধাম
উৎপীড়িত জন আজি লভিছে বিশ্রাম।
প্রেমের মঙ্গলস্পর্শে ফুটিয়াছে প্রাণ—
ব্যর্থ কি হইবে তব এই আত্মদান?

২৫.২.৪৭

তোমার লেখনীমুখে ছুটিত যে বাণী
সে তো শুধু নহে কাব্যকথা

ত্রিশ কোটি মানবের বেদনা লাঞ্ছনা
অন্তরের নিদারুণ ব্যথা
হে কবি তোমার করে ফুটায়েছ তুমি
শুনেছে জগৎ—
সাধের বাংলা তব দলিত-মথিত
নিপীড়িত জন
আজি তব জন্মদিনে একান্তে তোমারে
করিছে স্মরণ।

১২.৫.৪৭

কোন সুধারসে তব চিত্ত ছিল ভরা—
আজীবন বিলাইলে, এই বসুন্ধরা
নূতন করিয়া তুমি করিলে চিত্রিত,
মুহূর্তে করিলে জয় নিখিলের চিত।

১১.৫.৪৮

দিনলিপি

কুসুমকুমারীর দিনলিপি লেখার অভ্যাস ছিল। সাধারণ ছাত্র-ব্যবহার্য খাতায় 'দৈনন্দিন লিপি' নাম দিয়ে মোটামুটি নিয়মিত ডায়রি লিখতেন তিনি। 'দিনলিপি' ঠিক সাহিত্য নয়; কিন্তু একজন মানুষের অনুভূতি ও ভাবনাকে তার দেশকাল-চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আরও-কিছু মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার যে মূল কাজটি সাহিত্য করে থাকে, দিনলিপিও তা করে কখনও-কখনও। কুসুমকুমারীর জীবনের শেষ সাত-আট বছরের ডায়রি থেকে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধার করছি। একান্তভাবেই বিংশ শতাব্দীর মানুষ যাঁরা—তাঁদের ঠিক আগের প্রজন্মের মনের চেহারা কিছুটা এর মধ্যে পাওয়া যাবে। ১৯৪৮-এ মারা গিয়েছিলেন তিনি; ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন পৃথিবীকে দেখেছিলেন সত্তর-পার-হওয়া বয়সের মন নিয়ে। তাঁর জীবনবোধ, সাহিত্যবোধ, ঈশ্বরভক্তি, দেশচেতনা, স্বামীর স্মৃতি—সব-কিছুরই সরল ও অকুণ্ঠিত প্রকাশ আছে এই লেখাগুলিতে। চিহ্ন নেই কোনো কুসংস্কারের—আছে নিজেকে বিচার করার দুর্লভ-শক্তির পরিচয়; একটি শব্দও ব্যয়িত হয়নি অন্যের সমালোচনায়; ভাষায় আছে সূক্ষ্ম বোধ ও সুচারু সংযম। ডায়রির পাতাতেই কবিতা লিখে রাখতেন—যার অনেকগুলিই কখনও ছাপা হয়নি। যা পড়ে ভালো লাগত, তার অনুলিপি করে রাখতেন। ম্যাডাম ক্যুরি এবং পার্ল বাক্-এর কথা লিখে রেখেছেন দুটি জায়গায়; পাতার পর পাতা অনুলিপি করে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' ও 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ-দুটি থেকে। তাঁর দিনলিপি, অতএব পাঠকের কাছে হয়তো নিতান্ত মূল্যহীন মনে হবে না।

৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ : আজ জাপান যুদ্ধ declare করিয়াছে, খবরের কাগজে দেখিলাম। শুধু declare নয় decision-এর পূর্বেই আক্রমণ; সর্বদেশে সাধু মনীষী, বিশ্বপ্রেমিক আছেন, তবু এ কলহ কেন? কেহই কি স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে না? মৈত্রী কি শুধু কথায়ই পর্যবসিত হইবে?

১৪ ডিসেম্বর ১৯৪১ : একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম কাজের চাপে পড়িয়াও যে ম্রিয়মান বা বিষণ্ণ হয় না সেই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান। বড় বড় কথা বলি কিন্তু জীবনের পরীক্ষা অন্য জিনিস। উপলব্ধি ও আয়ত্ত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

বাল্য জীবনের খসড়া

৩০ অক্টোবর ১৯৪২ : ওঁর শরীরটা ক্রমেই যেন জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে— বড় ভাবনার বিষয়। কি যে কষ্ট হয়—কিছুতেই কিছু হইতেছে না। চিরজীবনের বন্ধু, সুহৃদ, একমাত্র পরামর্শদাতা, জীবন-গঠনের নিয়ন্তা...তবে কি দিন ফুরাইয়া আসিতেছে? কিছুতেই তো বিশ্বাস হয় না।

২১ নভেম্বর ১৯৪২ : সজ্ঞানে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। ভালমন্দের মধ্যে মন্দটুকু বুঝিলাম না। এই কি চিরবিদায়?

২১ ডিসেম্বর ১৯৪২ : আজ একমাস পূর্ণ হইল—ভোরবেলা অবিরলধারে নয়ন-জল ঝরিতে লাগিল—তুমি কি আমার কাছে আসিয়াছিলে? বিধাতার রাজ্যে তোমার বিজয় অভিযান সার্থক। ভগবানের প্রিয় সন্তান তুমি—নিশ্চয়ই আনন্দে আছ।

ডিসেম্বর ১৯৪২ : ডিসেম্বর মাসও শেষ হইল—দৈনন্দিন লিপি আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না—সে উৎসাহ সে আনন্দ সে পূর্ণতা কই? একজন গিয়া আমাকে একেবারে কাঙ্গাল করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আর তো প্রাণে শক্তি পাই না।...হে প্রভু এমনি করিয়া আমাকে একেবারে ফকির করিলে?...আমি তো চিরদিন প্রতি কার্যে তোমাকেই বিশ্বাস করিয়া প্রাণের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষায় তোমাকেই আমার একমাত্র বিধাতা বলিয়া জানিয়াছি। সকল নিবেদন করিয়াছি। যিনি আমার জীবন-পথের পাথেয়, অন্ধকারে আলোকবর্তিকা, শেষ জীবনের উৎসাহদাতা তাঁহাকে এমন করিয়া কাড়িয়া নিলে? এ দৈন্য আমার কিসে ঘুচাইব? যত দিন যায় ততই বেদনা বাড়ে।

৩০ এপ্রিল ১৯৪৩ : ভেবুলদের সঙ্গে রওয়ানা হইলাম কলিকাতায় ওদের সঙ্গে থাকিবার জন্য—এইবার মনে হইতেছে যেন ওঁকে ছাড়িয়া যাইতেছি।

অগাস্ট ১৯৪৩ : অগস্ট মাসটা বড় ভুগিয়াছিলেন—কি যে গাহিতেন, কি যে লিখিতেন, কি যে করিতেন এখন তার অর্থ বুঝিতেছি। গভীর রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও একি প্রশান্তি— !!! কিছুই জানিতে দিলেন না—শেষদিন পর্যন্ত কোনও

২৭শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী — সোমবার।

ডায়েরির পাতা থেকে

	ওজর-আপত্তি তুলিলেন না—কেবলই গাহিতেন—'উদিল তারা, গেলো রাত্রি/জাগিল অমৃত পথ যাত্রী।' এ গান কত গাহিলেন—আমি মুর্খ, বুঝিলাম না। আর একদিন মৃদুভাষ্যে ঘোর যন্ত্রণার মধ্যেও বলিলেন—'cross the bar.' প্রাণে প্রাণে কত নিহিত শক্তি যাহাতে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়।
২১-২২ অগাস্ট ১৯৪৩ (৫ ভাদ্র)	প্রায় চারিমাস এখানে আসিয়াছি। আজকাল বরিশালের জন্য মনটা বড় ব্যাকুল—কতদিন সে ঘরে যাই না—সেই স্থান—দেখি না—বৎসর তো শেষ হইয়া আসিল, এ কি স্বপ্ন! আর কথা শুনিব না—সে ডাক নীরব হইয়াছে।
১-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ :	এ কয়দিন মনটা যেন কেমন প্রসন্ন ছিল না। খুকুর চিঠি পাইতে বড় বেশি দেরি হইল। তারার চিঠি ৭ই পাইলাম। লাবণ্য ও মঞ্জুর চিঠিও আসিয়াছে। ... দাদাকে 'নির্বাণ ও সভ্যতার সংকট' রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠাইলাম।
২৬-২৭ নভেম্বর ১৯৪৩	কাল সমস্ত দিন মনটা প্রসন্ন ছিল না—কত দুর্বলতা আছে—এখনও সময়ে সময়ে বড় পরাজিত হই—লজ্জিত হইয়া মনোকষ্ট পাই।
১৭ জুলাই ১৯৪৫	এখানে আসিয়া একরকম দিন যাইতেছে। মিলু একলা রহিল। তার জন্য কষ্ট হয়। খুকু আসিয়াছে—এই সঙ্গে মঞ্জু যাইবে—খুকুর কাছে স্নেহে, যত্নে, আদরে থাকিবে, সু-শিক্ষা পাইবে এজন্যই তমলুকের মতো স্থানে রাখিতেছি। ওর জন্যও কষ্ট হইতেছে, আমার মনটা বড় নরম। সকলের জন্যই ব্যথা বোধ করি।
১ অক্টোবর ১৯৪৫ :	২২শে তো আসিয়া পড়িল...সন্ধ্যায় উপাসনা হইবে। ব্রজসুন্দরবাবু করিবেন। লাবণ্য তাঁকে বলিয়া আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর অতীত হইল—তবু তো বাঁচিয়া আছি। মানুষের প্রাণ কি কঠোর!
১১/২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ :	আমি কাহারও জন্য কিছু করিতে পারিতেছি না—এ আমার দারুণ দুঃখ। চোখে কিছুই দেখিতে পাই না—এও বড় কষ্ট—রাত্রে বড় বেশি অসুবিধা হয়। জীবিত থাকিতে যদি চক্ষু নিলে ভগবান তোমার এ সৃষ্টি দেখিবে

কে? আমি যে দিনরাত তাহাতেই মগ্ন থাকিতে চাই। ঊর্ধ্বে উঠাইয়া লও আমার আত্মাটিকে।

১ এপ্রিল ১৯৪৬ : বিকালে মনে এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্বাসের ভাব আসিয়াছিল কি বলিব—অনেকদিন প্রাণে এমন নবীনতা ও সতেজতার স্বাদ পাই নাই। তিনি আছেন, সর্বত্র তিনি, তাঁর প্রসারিত হস্তের দান কি বিচিত্র—এত উপাদানে এত আনন্দের আতিশয্যে তিনি ধরণীকে রমণীয় করিয়াছেন দেখিয়াও যেন দেখার চক্ষু হারাইয়াছি।

১৬ অগাস্ট ১৯৪৬ : ১৬ অগাস্ট বাংলার ভীষণ দিন। Direct action-এর দিন—হায়, হায় হিংসায় মানুষ কি না হয়—যে হিন্দু, মুসলমান এতকাল ভাই ভাই একই জল বাতাসে মানুষ, তারাই আবার বিদ্রোহী, বিরোধী।

৬ জানুয়ারি ১৯৪৭ : আজ ২১ শে পৌষ সোমবার জীবনের ৭২ বৎসর উত্তীর্ণ করিলাম! দইকে আনাইতে পাঠাইয়াছিলাম সে অসুস্থ—আনিতে পারিল না—এবার একাকী এই জীবনযাত্রা উদ্‌যাপন করিব। কাহাকেও কিছু বলিলাম না। যে ছেলে মেয়ে নিজ হইতে উৎসাহে আনন্দ করিতে চাহে সে স্বতন্ত্র—আমার বলিবার কিছু নাই। নিভৃতে নির্জনে চিন্তা করিয়াই আনন্দ পাই। ঘটনা পরম্পরা কোথা হইতে কোথায় লইয়া চলিয়াছে আমাকে। জীবনে অনেক কিছু দেখিলাম, শুনিলাম, জানিলাম, বুঝিলাম। যিনি প্রকৃত শিক্ষক হইয়া আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজ আর তিনি ইহজগতে নাই কিন্তু তাঁর সেই প্রাণপণ শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই মনে করি। আজও বরিশালের গৃহ অঙ্গন, প্রাঙ্গণ, প্রান্তর, লতা-প্রকৃতি আমাকে আকর্ষণ করে। জানি না সেই শেফালিগাছ আজও জীবিত আছে কিনা—কিন্তু সেই জায়গাটুকুর আকর্ষণও আমাকে টানে। সে স্মৃতি ভুলিবার নয় ... শেষ জন্মদিনের প্রার্থনা দিয়াই যেন তিনি গত, অনাগত, সকল জন্মদিনের সারণী বলিয়া গিয়াছেন—আর দরকার নাই ... সে সবই আজ মনে পড়িতেছে।

৯ জানুয়ারি ১৯৪৭ : আজ ভগবতী দেবী ও বিদ্যাসাগরের কথা বার বার মনে পড়িতেছিল। জীবনে তাঁদের পুণ্য প্রভাব কাজ করিলে কত উপকার। আজকাল রোজই গান্ধীর অভিযান পড়িয়া দেখিতেছি। এই অশীতিপর বৃদ্ধের কি অমানুষিক চরিত্রবল। যাহা করণীয় কর্তব্য মনে করিবেন সে জন্য জীবনদান করিবেন। মনোবল দেহবল্লকেও জাগ্রত করে।

১৩ জানুয়ারি ১৯৪৭ : জীবনস্মৃতি পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল এই যে মানবজীবনধারা ভগবান কিভাবে যে ইহাকে কোন পথ দিয়া কিভাবে বিকশিত করিয়া তোলেন তাহাই আশ্চর্য।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ এমনভাবে চলিব, ফিরিব, আহার্য গ্রহণ করিব যেন রোগকে ঠেকাইতে পারি। বারবার অসুখ হইবে কেন? কেন আপনাকে সংযত রাখিতে পারিব না?

৪ এপ্রিল ১৯৪৭ : ২৩ শে মার্চ আন্তঃদেশীয় সম্মেলন—দিল্লির পুরান কেল্লায় আরম্ভ হইয়াছে। ২৩টি দেশের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়াছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় এই রাজসূয় যজ্ঞের গৌরব বাহির হইতেছে। জহরলাল নেহেরু ও সরোজিনী নাইডুর ভাষণ খুব প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। আজ রবীন্দ্রনাথ নাই, তাঁর কথা খুব মনে হইতেছে।

২০ জুন ১৯৪৭ আজ ৫৮—২১ ভোটে বঙ্গবিভাগ হইল। ... এতদিনের যুক্ত বাংলা ছিন্ন হইল। বরিশালের কথা ভাবিতেও কষ্ট হয়। আমাদের কতদিনের, কত আশা-ভরসার বরিশাল, কত স্মৃতিজড়িত বরিশাল, সেই নাগকেশর ফুল—সেই—সেই নদীর পারের ঝাউবীথি—সেই স্বপ্নময় নদীতীর সবই আজ মনে পড়িতেছে।—বরিশাল তুমি সগর্বে বাঁচিয়া থাক। তোমার কীর্তি, তোমার যশ, তোমার স্বাতন্ত্র্য, তোমার মহত্ত্ব যেন লুপ্ত না হয়।— আজ পূর্ববঙ্গ ভারতছাড়া ভাবিতেও কত কষ্ট বোধ হয়। ভগবান তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হৌক।

১৫ অগাস্ট ১৯৪৭ : আজ কি আনন্দের দিন—পরাধীন ভারত গত রাত্র হইতে স্বাধীন হইয়াছে। আজ হিন্দু, মুসলমান এক বৎসরের বিদ্বেষ বিরাগ ভুলিয়া অনুতাপের অশ্রুমোচন করিয়া একই রাখীসূত্রে পরস্পর মিলিত হইল।

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ : চারিদিকেই মরণ, হানাহানি, দারুণ দুর্ভিক্ষের আভাস। এই কি স্বাধীনতার রূপ?

১০ মার্চ ১৯৪৭ : (মৃত্যুর আট মাস আগে, অত্যন্ত অসুস্থ শরীরে) যতদিন যাইতেছে মনে হইতেছে শরীর আমার ক্রমেই অবনতির দিকে—চক্ষের দৃষ্টি ম্লান, মনের আশা ক্ষীণ, প্রাণের উৎসাহ স্তিমিত। সেই যে পুনা যাইবার পথে বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিয়াছিলাম মনে পড়ে— সুদূরের ডাক নিকটে শুনি, চমকিয়া উঠি। ফর্দাপুরের সেই হাওয়া সেই নিস্তব্ধ পরিবেশ পাহাড়িয়া পথের দুর্গমতা সবই মনে পড়িতেছে। এলোরার বিস্তীর্ণ খোলা সামনেটা—মন্দিরের গাম্ভীর্য ও মৌনতা সবই আকর্ষণ করে প্রাণকে—তখন শরীরের গ্লানি একটু ভুলিয়া থাকি—পরে শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য। দেশ নাই, কাল নাই, মানুষ নাই, স্নেহ, দয়া প্রেম নাই, আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই সে কেমন জীবন—সর্বপূর্ণ করিতে হইবে প্রাণ দিয়া—কিন্তু সে প্রাণ কই?

বিরল অন্তর্দীপ্তিতে উজ্জ্বল এই দিনলিপি। শেষ উদ্ধৃতিটিতে -চেতনা যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়—তখনও তাঁর মন আত্মপ্রীতি, সংসারপ্রীতি, এমনকী ঈশ্বরপ্রীতিকেও ছাড়িয়ে বিশ্বের নিঃসীমতাকে প্রাণ দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিল।

কবিতা-নাম ও প্রথম পংক্তির সূচি